টি. এস. এলিয়ট ঃ বাঙালী মন ও মননে

সম্পাদনা—তাপস বসু

পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা-৯

প্রকাশ : আষাঢ় ১৩৬৬

প্রচ্ছদ শিল্পী : অতনু বসু

প্রকাশক : সংহতি চৌধুরী
জীবনানন্দ আকাদেমি
ব্লক—আই/বি ফ্লাট—১
অবন্তিকা সরকারী আবাসন
কলকাতা-৩৯

মুদ্রণালয় : বঙ্গবাসী লিমিটেড (প্রেস)
২৬, পটলডাঙ্গা স্ট্রীট
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ মুদ্রণ : ওয়েলনোন প্রিন্টার্স
কলকাতা-৯

● প্রাবন্ধিক পরিচিতি ●

রাম বসু :	বিশিষ্ট কবি, কাব্যনাট্যকার এবং প্রাবন্ধিক; রবীন্দ্রপুরস্কারে সম্মানিত।
তরুণ সান্যাল :	স্কটিশচার্চ কলেজের অর্থনীতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক। কবি এবং প্রাবন্ধিক। 'পরিচয়' পত্রিকার পূর্বতন সম্পাদক।
চিন্ময় গুহ :	বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক। আলিয়াঁস ফ্রাঁসের ফরাসী ভাষার অধ্যাপক। সম্প্রতি ফরাসী ভাষা চর্চার সূত্রে ফ্রান্স ঘুরে এসেছেন।
সুমিতা চক্রবর্তী :	বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। সমালোচক, প্রাবন্ধিক।
উদয় কুমার চক্রবর্তী :	যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। প্রাবন্ধিক এবং ভাষাতত্ত্বের নিবিষ্ট গবেষক।
তরুণ মুখোপাধ্যায় :	চন্দননগর গভর্ণমেন্ট কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। কবি এবং প্রাবন্ধিক। বাংলা কাব্যনাট্য নিয়ে গবেষণায় রত।
কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায় :	অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, বঙ্গবাসী মর্নিং কলেজ এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। কবি এবং প্রাবন্ধিক।
শকুন্তলা দেবী :	বহরমপুর গার্লস কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা। বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদক এবং প্রাবন্ধিক।
বিমল কুমার মুখোপাধ্যায় :	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। সাহিত্যতত্ত্বের বিশিষ্ট গবেষক এবং প্রাবন্ধিক।

বিজয় দেব : জাতীয় গ্রন্থাগারের সহঃ গ্রন্থাগারিক। প্রাবন্ধিক এবং অনুবাদক।

অমিতাভ গুপ্ত : গোয়েঙ্কা কলেজ অফ কমার্সের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক। কবি এবং প্রাবন্ধিক।

জগন্নাথ চক্রবর্তী : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক। কবি এবং প্রাবন্ধিক। প্রকাশিতব্য জাতীয় অভিধান গ্রন্থের প্রধান সম্পাদক।

মঞ্জুভাষ মিত্র : বিধানগর গভর্ণমেণ্ট কলেজের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক। কবি এবং প্রাবন্ধিক।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় : বিশিষ্ট কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক। কৃত্তিবাস পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। ভারতীয় সাহিত্যিক রূপে পাশ্চাত্যের নানা দেশ পরিক্রমা করেছেন। বঙ্কিম পুরস্কার এবং আকাদেমি পুরস্কারে সম্মানিত।

শরৎ কুমার মুখোপাধ্যায় : কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পকার এবং অনুবাদক।

জ্যোতি ভট্টাচার্য : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক। প্রাবন্ধিক এবং সমালোচক।

অজয় রঞ্জন বিশ্বাস : বর্ধমান বিবেকানন্দ কলেজের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক। ইংরেজি সাহিত্যের নানা জাতীয়, আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ করেছেন। বিশ্বভারতী, বিদ্যাসাগর এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অতিথি অধ্যাপক।

তাপস বসু : অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বঙ্গবাসী কলেজ, কলকাতা এবং কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, নদীয়া। সম্পাদক, জীবনানন্দ আকাদেমি। কবি, প্রাবন্ধিক এবং সমালোচক।

● সূচীপত্র ●

তাপস বসু'র অন্যান্য গ্রন্থ :

ভাঙনের থিয়েটার

কবিতার ভুবন (যন্ত্রস্থ)

বাংলাদেশের কৃষি অর্থনীতি, কৃষক জীবন ও সাহিত্য (যন্ত্রস্থ)

জীবনানন্দ দাশ ও সমকালীন ভাবনাক্রম (সম্পাদিত)

মার্কসবাদীদের দৃষ্টিতে বিবেকানন্দ (সম্পাদিত)

অন্তর্গত রক্তের ভিতরে (কাব্যগ্রন্থ)

টি. এস. এলিয়ট : মরু তীর হতে

রাম বসু

টি. এস. এলিয়ট এমন একজন কবি, কয়েক যুগ ধরে যিনি পাঠক সমাজকে সমান ভাবে আলোড়িত করে চলেছেন। কেউ তাঁকে মেনেছেন প্রাজ্ঞ দ্রষ্টা বলে; কেউ বা তাঁকে পাঠিয়েছেন নরকে। কিন্তু অস্বীকার করে, নীরব উপেক্ষায় মুখ ফিরিয়ে নিতে পারেন নি কেউ-ই। ইয়োরোপে এলিয়টীয় জোয়ারে আজ হয়তো ভাঁটা পড়েছে; কিন্তু তাঁর কবিতার ধীমানচর্চার বিরতি ঘটে নি এতটুকু। কবির জনপ্রিয়তা অনেক সময় যুগ-রুচি ও ফ্যাসনের ওপর নির্ভরশীল। যুগরুচি ও ফ্যাশন নিত্য পরিবর্তমান। হাওয়াবদলের সঙ্গে সঙ্গে টান পড়ে জনপ্রিয়তায়। উচ্ছ্বাস হয় স্তিমিত। এলিয়ট সম্পর্কেও এ কথা প্রযোজ্য। তিরিশের যুগে যে কবি দারুণ ভাবে আলোড়িত করেছেন পশ্চিম ইয়োরোপের মানুষকে, আজ আশির শেষ প্রান্তে তিনি শুধুমাত্র রসগ্রাহী পাঠকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু যা আছে, তাই-ই সত্য। উচ্ছ্বাসের আবিলতা কেটে গেলে যা থাকে সেই-ই তার সত্য মূল্য, হীরকদ্যুতি। ইংরেজী এবং পশ্চিম ইয়োরোপীয় ভাবজগতের আলোচনায় এলিয়ট অনিবার্য উচ্চারিত নাম। তাঁকে বাদ দিয়ে আধুনিক কবিতার আলোচনাই অবাস্তব।

আমাদের বাংলাদেশের কলোনীয়াল মানসিকতায় এলিয়ট ছিলেন একদিন অপ্রতিহত সম্রাট। তিরিশের যুগের মানসলোককে তিনি নিঃসন্দেহে বিপুল ভাবে প্রভাবিত করেছেন এবং সেই প্রভাব সঞ্চারিত হয়েছে অনুজদের মধ্যেও। অবশ্যই স্বীকার্য, যে মানসিক ও

সাংস্কৃতিক প্রস্তুতি, গ্রহণের উপযোগী বৈদগ্ধ ও আর্থ-সামাজিক পরিমণ্ডল থাকলে এলিয়টকে আমরা অনুকরণের স্থূলতা থেকে সরিয়ে আত্মীকরণ করতে পারতাম সার্থকভাবে; আমাদের ও সাহিত্যের উর্বরতার জন্য, তা আমরা পারি নি। সেই আমাদের উচ্চকিত সীমাবদ্ধতা।

নিজের অনেক কথাই মনে পড়ে। মনে পড়ে অকস্মাৎ কেমন ভাবে আমার সামনে দরজা খুলে গেল আর আমি অপরূপ আলোর মুগ্ধতায় বিহ্বল হয়ে থাকলাম।

কলেজ জীবনের প্রথম দিক। একদিন বেশ একটু রাত করে কলেজ ষ্ট্রীট দিয়ে ফুটপাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে ফিরছি বিবেকানন্দ রোডের দিকে। তখনো বোধহয় রাস্তায় গ্যাসের আলো; ঘোড়ার গাড়ি চালু। বসন্ত কেবিনের ওখানে আবর্জনা ঢালা, খালি ডিমের খোলা ইত্যাদি। ইঁদুর ঘুরঘুর করছে। আমি একা ছিলাম না। সঙ্গে ছিল আমার এক বন্ধু। উত্তর কলকাতার এঁদো গলির নিতান্ত মধ্যবিত্ত তনয় হয়েও কি করে ও যে পেয়েছিল পশ্চিমী হাওয়া তা অন্য কথা। ম্যাডান ষ্ট্রীট, ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীটের ফুটপাতের দোকান থেকে কিনতো পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সেকেণ্ড হ্যাণ্ড রেকর্ড। তক্তপোষের ওপর বসে চোঙা-ওয়ালা পুরানো গ্রামাফোনে পুরানো রেকর্ড চাপিয়ে সত্যিই তন্ময় হতো সে। যাক সে কথা।

কলেজ স্কোয়ারের ওপর চাঁদ টলমল করছে মাতালের মতো। এদিকে সেনেট। হঠাৎ সে গলা চড়িয়ে আবৃত্তি করতে থাকলো—

Half past three
The lamp sputtered,
The lamp muttered in the dark.
The lamp hummed :
'Regard the moon,
La lune ne garde aucune rancune,
She winks a feeble eye,
She Smiles into corners.
She Smooths the hair of the grass
The moon has lost her memory.
A washed-out Small pox crakes her face.

'কার কবিতারে ?' জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

'এলিয়টের। পড়িস নি?'

'না।'

'একদিন আসিস। আমার কাছে কালেকটেড্ পোয়েমস্ আছে। তোকে দেবো।'

'এটা কোন কবিতা? সবটা জানিস?'

'র‍্যাপসডি অন এ উইণ্ডী নাইট। সবটা হয়তো পারবো না। আয়।'

কলেজ স্কোয়ারের বেঞ্চের ওপর বসে সে আমাকে শুনিয়েছিল এলিয়টের কবিতা। শুনিয়েছিল এলিয়ট প্রসঙ্গে কিছু কথা।

এই আমার প্রথম পরিচয়। তারপর থেকে পরিচয় গাঢ় ও গভীরতর হয়েছে—এ কথা বলার স্পর্দ্ধা নেই। তবে এক অদ্ভূত 'ভালবাসা-ঘৃণা'র সম্পর্কের মধ্য দিয়ে জটিলতর হয়েছে। এ কথা কবুল করতেই হবে। সাম্যবাদী হয়েছি। হতাশবাদ যে মায়াবী গরল তা শিখেছি। আবার ফাদায়েভ যখন এলিয়টকে টাইপরাইটারে বসা হায়নার সঙ্গে তুলনা করলেন ক্ষোভে ফেটে পড়েছি।

তবু যা শেখা দরকার ছিল তা শিখতে পারি নি। স্বীকার না করে উপায় নেই। আমার মাটি তো তৈরি ছিল না। পড়াশুনোর পরিধি খুবই সংকীর্ণ। আর সেই নিরলস সাধনা, সেই কঠিন নির্লিপ্তি ও ধ্যানব্রত, জীবনের গভীরে যাবার সেই দুর্বার আগ্রহ, অপার বৈদগ্ধ—সে সব কিছুই তো পাই নি। একথা অকপটে স্বীকার করে আজ এই উপলক্ষে জানাই বিনীত প্রণাম। এরপর এলিয়ট সম্পর্কে আমি যা বলবো তাকে প্রবন্ধ হিসেবে না ধরাই ভালো। একে আমার ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভাবনার উদাহরণ হিসেবে ধরলেই খুশি হবো।

॥ ২ ॥

দান্তে এলিয়টের অন্যতম প্রিয় কবি। ডিভাইন কমেডির ওপর তাঁর অসাধারণ আলোচনা সকল দিক থেকে দিগ্‌দর্শী। কাব্যজীবনে যেমন নিজেকে বেঁধেছেন তিনি কঠিন অনুশাসনের ধ্রুবপদে সমালোচনার ক্ষেত্রে তার শৈথিল্য নেই একবিন্দু।

কিন্তু অনেক সময় মনে হয়, হয়তো *অন্য* অর্থে ডিভাইন কমেডি তাঁর কাব্যসাধনার প্রতীকীরূপ। সেই নাস্তির নরক পরিক্রমা এবং তারপর শান্তির স্বর্গীয় সুষমা। সে কি কবি এলিয়টের মহাপ্রস্থান? প্রশ্ন থাকে।

ইতি নেতির নিরন্তর গোধূলিতে, দ্বন্দ্ব সংঘাতের অবিরত যুদ্ধে মানুষ চিরকাল বাঁচতে পারে না। ঝড় তুফানের হন্তে দাঁতে শতছিন্ন হতে হতেও জাহাজকে একদিন খুঁজে পেতে হয় বন্দর। কোন সৎ কবির কাছে সেই বন্দর হতে পারে দূর অতীতের মধ্যযুগ যা রোম্যানটিক রূপকথার কল্পিত আশ্রয়; অথবা বানানো, মন-গড়া তত্ত্বের বালির দুর্গ অথবা হয়তো ইতিহাসের অনিবার্য অগ্রগতি। তা হলেও তাকে হতে হবে অনুভূত সত্য। এবং সেই অনুভূতি হওয়া চাই তাৎক্ষণিক ও শারীরিক, প্রত্যক্ষ ও বাস্তব। আর তখনই খসে যায় নৈর্ব্যক্তিকতা, ইমপারসনালিটির নির্মোক। ঠিক এই জিনিষটি কি ঘটেনি এলিয়টের ক্ষেত্রে? নির্লিপ্তির নিরাসক্ত শীতল মুখোশ কি খুলে যায় নি চার্চের অর্গানের সুরে আর সূর্যাস্ত বেলায় বৈতজীবনের নীরব প্রণামে?

আর এ যাত্রা সহজ নয়। এ এক দুঃসহ অভিযান। পুঁজি শুধু আত্মিক শুদ্ধতা ও সততা। নিরন্তর আত্মবীক্ষণে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে অনাবৃত করা নিজের একান্ত সত্য সত্তাকে। এ হল আত্মিক অভিযান। সৎ কবি এক অর্থে ইউলিসিস।

ইতিহাস যেমন দীর্ঘ তেমন জটিল, অন্তত শিল্পোন্নত পশ্চিম ইয়োরোপের ক্ষেত্রে। কবিকে অতি সচেতন ভাবে স্থাপন করতে হয় সেই ইতিহাসের জটিল ঘূর্ণিতে। আপন অস্তিত্ব বিপন্ন করে খুঁজতে হয় চূড়ান্ত 'আমি'-কে। এই তো নিয়তি, কবির নিয়তি। তাই হোল্ডারলীনের মতো কবিকেও আর্তনাদ করতে হয় **'in such spiritless time, why to be a poet at all?'** হেগেল আরোপ করেন গুরু দায়িত্ব কবির ওপর, **"Poerty will have to take on the business of so thorough a recasting and remodelling of reality that, faced with the unyielding mass of prosaic, it will find itself involved in manifold difficulties "**

"ম্যানিফোল্ড ডিফিকালটিজ" আসতে আরম্ভ করেছিল কিছু আগে থাকতেই। সামন্ততন্ত্রবাদের পতনের পর থেকে; মধ্যযুগীয় সংশ্লেষণ, মিডিয়েভাল সিনথিসিস, ঘুচে যাবার পর থেকে। কিন্তু তার হিংস্র রূপ কর্কশ নগ্নতায় প্রকাশিত শিল্পবিপ্লবের যুগে। ছিন্ন ভিন্ন মানুষ, বাইরে এবং ভিতরে। রক্তাক্ত। অথচ এই রক্তক্ষরণ দেহের ভিতরে। সে তার নিজের কাছে এক নয়, বহু। একে অপরের সঙ্গে দেবাসুরের যুদ্ধে নিরত। এই রক্তাক্ত সত্তার আর্তি অপরূপ ভাষা পায় মার্কস-এর কাছে শীলারের

চিঠিতে। এই হল ফ্রাগমেনটেশন অব ম্যান, ডিভাইডেড সেল্ফ, মালটিপল সেল্ফ। আর মার্কস তাঁর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করেন অ্যালিয়েশন তত্ত্বে। বিষ্ণু দেও প্রকাশ করেন এই ভাবে, 'ছত্রধর নেই আজ সম্পূর্ণ মানব।' তাঁর স্মৃতি অবসর বিনোদনে দ্বারকায়, স্মৃতি তার যমুনার নীল জলে বৃথা মাথা কোটে।

ইয়োরোপ সে দিন অগ্রাহ্য করেছে মার্কসকে। করে লাভ হয় নি। বরং আত্মক্ষয়ে হয়ে গেছে পাংশু নীল। আর এই ঘুরপথে যেতে যেতে রোম্যানটিক-সিম্বলিস্টরা ভ্রান্ত রীতিতে অনিবার্য প্রশ্নকে একান্ত করে তুললো—চূড়ান্ত কি তবে? কি অপরিবর্তনীয় নিত্য সনাতন? কবিতা না রাজনীতি? হয়তো বোদলেয়র থেকে এর সুরু। কবি 'পারিয়া না অ্যারিসট্রোক্যাট', নাকি উভয়ত? এই প্রশ্ন টেনে আনে বোদলেয়রকে, ১৮৪৮ এ ব্যারিকেডের সামনে; আবার তাঁকে ঠেলে দেয় অশুভ পুষ্পের সুগন্ধি নরকে। ১৯১৬ সালের আইরিশ অভ্যুত্থান ইয়েটসকে লেখায়, 'এ টেরিবল বিউটি ইজ বর্ণ', আবার এই ইয়েটসকে ঠেলে দেয় নিরাবয়ব শুদ্ধ প্রতীকে কিংবা ফ্যাসিবাদের প্রতি আসক্তিতে। এই উতলা আর্তি রুশ বিপ্লবের ব্লককে লেখায় 'দ্য টুয়েলভ'। আবার নিয়ে যায় আত্মহননে। এই প্রশ্নই ১৯১৭ সালে টমাস মানকে এই সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য করে, আজ 'the destiny of man presents its meaning in political terms।' সামগ্রিক অবস্থাকে সমাজ বিজ্ঞানী অধ্যাপক মাইকেল পোলানি এই ভাবে প্রকাশ করেন, "It has erupted in two directions, to wards art and philosophy and towards politics The first was a move towards extreme individualism, the second, on the contrary, towards modern to totalitarianism'। অবশ্য এই সব বুদ্ধিজীবীদের কাছে টোটালিটেরিয়ানিজম বলতে বোঝায় সাম্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ।

সৌভাগ্য বলতে হবে এলিয়টের ক্ষেত্রে প্রশ্নটা এল এই ভাবে—মালটিপল সেল্ফ না ইউনিটি অফ সেল্ফ? আমার অনেক মুখ। কিন্তু কোন্ মুখটা একান্ত আমার? আমার অনেক সত্তা। কোন্ সত্তায় আমার সমগ্র? এই আমার এমপিরিক্যাল সত্তা সত্য; নাকি সত্য আমার কবিসত্তা? সিম্বলিস্ট ঐতিহ্য ধরে এলিয়টও এমপিরিক্যাল সত্তা এবং কবিসত্তাকে ভাগ করলেন। কবিসত্তাকে সামাজিক সত্তার সামগ্রিক প্রকাশ হিসাবে দেখতে পারলেন

না। ফলে ইয়োরোপীয় চিন্তাজগতের এ্যালিয়েনেশন বা আত্মচ্যুতির ভূত তাঁর ঘাড় থেকে নামলো না। তিনি সেই আত্মহননকারী প্রশ্ন—who is the third who always walks beside you?— তার থেকে মুক্তি পেলেন না। চারদিকে ফাঁপা মানুষের ভিড। কফির চামচ দিয়ে জীবনকে মাপা আর অর্থহীন কথায় ক্লান্ত বিরক্তি। কিন্তু কবিসত্তাকে চূড়ান্ত বলে স্বীকার না করেও তিনি এমপিরিক্যাল সত্তাকে এমন কঠোর বিশুদ্ধতায় গ্রহণ করলেন যা প্রকৃতপক্ষে হয়ে উঠলো ছায়া, মরীচিকা; সব ধরা ছোঁয়ার বাইরে। তা হলেও, বড় পার্থক্য থাকলো। তিনি কোন মতে এমপিরিক্যাল সত্তা ও কবি সত্তার মধ্যে একটা ভারসাম্য খুঁজছিলেন। মনে ধরে নি ওয়ালস স্টিভেনস্-এর পথ "to be a poet at all one ought to be a poet constantly"। কিন্তু একাকিত্ব, নিঃসঙ্গতা ও অর্থহীনতার দায় ভাগ থেকে মুক্তি নেই। স্বল্পস্থায়ী লিরিক্যাল পর্ব পার হবার পর সুরু হল এলিয়টের নরক পরিক্রমা যার নাট্যগুণান্বিত কাব্যরূপ জে. আলফ্রেড প্রুফর্ক। সে জানে, 'No! I am not prince Hamlet, nor was meant to be"। পোর্ট্রেট অব এ লেডীতে প্রেমের দৃশ্য মনে করায় অ্যান অ্যাটমোসফিয়ার অব জুলিয়েটস টুম্ব। এই নরকের অবিনশ্বর কাব্যময় রূপ ওয়েস্ট ল্যাণ্ড যার সম্পর্কে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনার অন্ত নেই।

নিজের সত্যস্বরূপকে জানার জন্য অহর্নিশ আত্মদহন তাঁকে নিয়ে গেল খৃষ্টতত্ত্বের দিকে। পূর্ববর্তী এবং তাঁর সমসাময়িক কবিরা যেমন ভাবে বেছে নিয়েছিলেন বাঁচবার পথ, ধর্মে হোক, রাজনীতিতেও হোক, দূর অতীতের কল্পনাশ্রয়ী বিরোধহীন স্বপ্নে হোক, অথবা হোক তথাকথিত শুদ্ধ শব্দের ধ্বনিময়তায়, এলিয়টকেও বেছে নিতে হল এ্যাংলিকান বা এ্যাংলো ক্যাথলিক চার্চ, রাজতন্ত্র, রক্ষণশীলতা। রিলকে কিংবা পাউণ্ডের সহযাত্রী হয়ে ফ্যাসিবাদের মতো ভয়াবহ মানবশত্রুকে না বাছলেও এলিয়ট বেছে নিলেন প্রতিক্রিয়া। এই সত্যকে অস্বীকার করা অসম্ভব। কবি কেন মতবাদ বেছে নেন? একটা অভাববোধের জন্য, তার থেকে নিষ্কৃতির জন্য। এই অভাববোধ বিচিত্র। ব্যক্তিত্বের বৈচিত্রের মতো বিবিধ। এলিয়টের ব্যক্তিত্বের সংকট থেকেই এই নির্বাচন। অথবা মরীয়া মানুষের কুটোকে আঁকড়ে বাঁচবার আগ্রহ।

'ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' রচিত হয়েছে অ্যাংলিকান চার্চে দীক্ষিত হবার পর। তবু

এখানে 'গ্রেস' নেই। আছে সেই নাটকীয় ধারণায় অভিসিক্ত মিথের ওপর প্রতিষ্ঠিত পিউরিটান মনের সংশয় ও নৈরাজ্য, অনাবৃষ্টি দগ্ধ দেশে জলের আকাঙ্ক্ষা আর হায়াসিন্থ গার্ল, যে প্রতীক বাঁচাতে পারতো তার অন্ধকার উর্বরতায়। নরক পরিক্রমা সমানে চলেছে। এখানেও বিরতি নেই খৃষ্টধর্মে ঘোষিত অনুরক্তি সত্ত্বেও। কারণ কবিতায় পালাবদল অনায়াস লব্ধ নয়। চাই কনসেপশন ও পারসেপশনের হরগৌরী মিলন।

কিন্তু নতুন একটা দিগন্তরেখা খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়। কারণ খৃষ্ট ধর্ম কবির কাছে সামাজিক প্রথার স্বীকৃতি নয়, আত্মার নির্মাণের মৌল উপাদান। তাই বলেন, "The progress of an artist is a continual self sacrifice, a continual extinction of personality।" ওয়েস্ট ল্যাণ্ড প্রকাশিত হবার আগে বিখ্যাত তত্ত্ব শোনা যায়—কবিতা আবেগের প্রকাশ নয়, আবেগ থেকে পালানোর পথ; ব্যক্তিত্বের প্রকাশ নয়, ব্যক্তিত্ব থেকে নিষ্ক্রিতির পথ। কিন্তু যাদের আবেগ ও ব্যক্তিত্ব আছে তারাই বুঝতে পারে এই কথার অর্থ।

পরিপূর্ণ খৃষ্টান হবার জন্য ব্যক্তিত্বের বিনাশ অনিবার্য শর্ত। খৃষ্টীয় মরমীয়াবাদ বলে অহংকে সম্পূর্ণভাবে নাশ করতে হবে। নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে নিবেদন করতে হবে ঈশ্বরের কাছে। ওদের ভাষায় একে বলে পারগেশান; শান্তশীল জীবনের জন্য অপরিহার্য। সুসোর কথায়, "a perpetual giving up of self and make god's honour and glory sole aim, just in the way that dear Christ acted towards his heavenly Father"। কিন্তু তার অর্থ আবার সংসার বৈরাগ্য নয়। এই জগৎ সংসারকে সত্য বলে স্বীকার করে, তা এমপিরিক্যাল হলেও, ধ্যানে ও চিন্তায় ঈশ্বরের সমীপবর্তী হতে হয়। একহার্টের কথায়, "one must learn an inner attitude [in which, it is implied, one must be conscious of God,] whatever one may be"। অহং বা ইগো কিংবা সেল্‌ফ ও পারসোনালিটি সমার্থক না হলেও সব কটি মিলে মিশে এমন ভাবপ্রতিমা তৈরি হয়েছে যাকে পৃথকীকরণ অ্যাকাডেমিক দার্শনিকের এক্তিয়ারে। সে যাই হোক কোনটাকে বাদ দিয়ে কোনটা নয়। তাই সেলফ-কে বিসর্জন না দিলে ঈশ্বরের দ্বারা হৃদয় পূর্ণ হতে পারে না। (থিওলজিকা জার্মানিকায় বলা আছে "If we are to know the Perfect, 'the "I", the self and the like must all be lost and

done away'। এই পটভূমিতে একহার্ট বলেন মানুষ প্রকৃতির ওপরে নয়, সময়ের বাইরে নয়, কিন্তু সে সময় ও প্রকৃতিকে ছাড়িয়ে যেতে সমর্থ। সুইনী কবিতাগুচ্ছে তো এলিয়ট এই মর্মে সেণ্ট জন অব ক্রশ-এর উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন।) খৃষ্টীয় মরমীয়াবাদীর দৃষ্টিতে যদি এলিয়টকে দেখা যায় তবে হয়তো একটু স্পষ্ট ভাবে বোঝা যায় কী গভীর অর্থে তিনি ওই কথাগুলি বলেছেন।

এরই সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত অবজেকটিভ কোরিলেটিভের কথা। যেহেতু ব্যক্তিত্ব থেকে মুক্তি বৈরাগ্য বা ওয়াণ্ড ফ্লাইট নয়, তাই সাবজেক-টিভিটি অভিজ্ঞতা প্রকাশের বাহন হতে পারে না। তা হলে সে হয় শব্দ পুঞ্জ যা 'সাউণ্ড উইথাওউট সেন্স'। তাকে খুঁজে পেতে হবে অবজেকটিভ কোরিলেটিভ। কেন খুঁজতে হবে ?—এলিয়ট বিশ্বাস করেন-মালটিপ্লিসিটি থেকে মুক্ত হয়ে ক্ল্যাসিকাল অর্থে ব্যক্তি ও সমাজের সাযুজ্য সম্ভব। তাই বাস্তব অবাস্তব নয়। সাযুজ্য বাস্তব সমাজেই সম্ভব।

সাযুজ্যের জন্য তত্ত্ব চাই। চাই দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি। কবিতার সঙ্গে দর্শনের যোগাযোগ অবশ্যসম্ভবী। ভ্যালেরীরা বলতেন, না কবিতার জন্যে দর্শনের দরকার নেই আদৌ। স্বীকার করতে পারেন নি এলিয়ট। তিরস্কার করতে কুণ্ঠিত হন নি ভ্যালেরীকে। সেক্রেড উড-এ দান্তের ওপর প্রবন্ধে এই কথা বলেছেন স্পষ্ট করে। তিনি দেখালেন দান্তে কি ভাবে তৎকালীন দার্শনিকদের আত্মীকরণ করেছেন। তবু এই প্রসঙ্গে এলিয়টের সিদ্ধান্ত স্ব-বিরোধী, মনে হয় ঘুরে ফিরে তিনি তিরস্কৃত ভ্যালেরীর কাছাকাছি গিয়েছেন, কিন্তু তার নিজের কবিতা তাঁর তত্ত্বকে খণ্ডন করে। চারশ' তিন লাইনের ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড কবিতায় তিনি কম করে পয়ত্রিশ জন কবি দার্শনিকের উক্তি ও অনুষঙ্গ ইত্যাদি ব্যবহার করেছেন। তা নিয়েও ওয়েস্ট-ল্যাণ্ড একসঙ্গে মহৎ কবিতা এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ কবিতা। না হলে রোম্যানটিক কবিদের বায়বীয় বলে উপেক্ষা করে বরং ড্রাইডেনকে বরণ করা অর্থহীন হয়ে পড়ে।

যাই হোক ওয়েস্ট-ল্যাণ্ডের যুগে চার্চ বিশ্বাসী কবি কিন্তু নরক থেকে নিষ্ক্রমণের পথ পান নি। যে জলের প্রতীক এসেছে উর্বরতা ও পুনর্জন্মের ত্যোতনা নিয়ে তা কিন্তু সৃষ্টির অন্যতম মৌল ও আদিম উপাদান 'অপ্' হয়ে উঠতে পারে নি। তবু প্রশ্নকারী অজ্ঞেয়বাদী এলিয়ট এখন চার্চবিশ্বাসী খৃষ্টান। 'দ্য রক' অথবা 'মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রাল' বিশ্বাসীর জবরদস্তি

ঘোষণা, নাটকীয় বিবর্তনে শারীরিক ভাবে অনুভূত সত্য নয়। এ সব সত্ত্বেও দিগন্ত রেখায় ক্ষীণ আলোর রেখা লক্ষ্য করা যায় এই সময়ের এলিয়টের তত্ত্বে। তত্ত্বগুলিকে আলাদা করে দেখলে কবির বিবর্তনে তার গুরুত্ব মুছে যায়। হয়ে পড়ে শুকনো বাদামের খোলার মতো নীরস পুঁথি।

বহু সত্তা থেকে ঐক্যময় সত্য সত্তা কি—এই যদি হয় এলিয়টের কাব্য চর্চার প্রথম ও একমাত্র থীম, তবে বিশ্বাসী খৃষ্টান হবার পর এই সব তত্ত্ব তাকে আশ্বাস দিয়েছে জগৎ জীবন মিথ্যা নয়। এমপিরিক্যাল সত্তা অর্থহীন নয়। বাস্তবতা বর্জনীয় নয়। সিম্বলিস্ট সুররিয়ালিস্ট পথ অভ্রান্ত নয়। এই বাস্তব সময়কে স্বীকার করে যেতে হবে সময়ের অতীতে। দর্শনশাস্ত্রে সময়ের সমস্যা খুবই জটিল। এলিয়টকে দেখা যায় সময়কে তিনি বাস্তব ও মানবিক অর্থে গ্রহণ করেছেন। এলিয়টের সময় হিউম্যানিস্টিক টাইম। মোটামুটি ভাবে একই পথে গিয়ে সমাধান পান নি উনমুনো। সময়কে তিনি মানবিক করতে পারেন নি। কারণ তাঁর কাছে খৃষ্ট নায়ক মাত্র। বিশ্বাস তাঁর কাছে মরমীয়া প্রয়াস। কিয়েকাগার্দের 'লীপ ইন দ্য ডার্ক' এর মতো। ট্রাজিক সেন্স ছিল, ছিল না গ্রানজার। তাই উনমুনো একজিস্‌টেনসিয়ালিস্টদের পূর্বসূরী হয়ে পড়েন। এলিয়টের ক্ষেত্রে তা হয় নি। কারণ তিনি প্রত্যক্ষকে স্বীকার করে সময়কে মানবিক করে তুলেছেন। খৃষ্ট তাঁর কাছে শুধু নায়ক নন, বোধও। কালের মধ্যে হতে চান কালজয়ী।

অবশ্যই ধর্ম আছে। চার্চ আছে। প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতি আছে। তা থাকলেও এলিয়ট প্রতিক্রিয়াশীলতার হাত ধরে ব্রিটিশ রক্ষণশীল পার্টির সঙ্গে একাত্ম হতে পারেন নি। দ্য আইডিয়া অব এ খৃষ্টিয়ান সোসাইটিতে যে সমাজের রূপরেখা তিনি দেন তার থেকে অনেক দূর সরে আসেন পরবর্তীকালের নোটস টুওয়ার্ড এ ডেফিনেশন অব কালচার-এ। সেণ্ট জন অব দ্য ক্রশ কথিত 'লাভ টুওয়ার্ডস্ ক্রিয়েটেড্ থিংস' সম্পর্কে যে অবজ্ঞা অনীহা বিরক্তি প্রথম থেকে সূচিত, 'সেন সুয়াস নেস'-এর প্রতি যে ঘৃণা স্পষ্ট, তা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায় 'অ্যাস ওয়েডনেসডে' পর্ব থেকে। তাই যে ধর্ম এলিয়ট গ্রহণ করেন তা হয় মানবিক ধর্ম। সকল অর্থে 'অ্যাস ওয়েডনেসডে' এলিয়টীয় বিবর্তনে দিগন্ত রেখা। হতাশা, বেদনাতুর বিশ্বাস মিলিয়ে যেতে থাকে। পার্থিব ও সৃষ্ট বস্তুনিচয়ের প্রতি আসক্তি খুঁজে পান। খৃষ্ট বিশ্বাস তাঁকে জগৎ জীবনকে অস্বীকার করার প্রবণতায় টেনে

যায় নি। বরং তাঁকে আসক্ত করেছে এমপিরিক্যাল জীবনের প্রতি। সুতরাং ধর্ম হলেই প্রতিক্রিয়াশীল হতেই হবে এই যান্ত্রিক প্রয়োগ এলিয়টের ক্ষেত্রে অর্থহীন। বহু সত্তা বা মালটিপল সেল্ফ, শুদ্ধ শিল্প ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য-বাদ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি যান ঐক্যের দিকে—একটি সত্তার দিকে যা সুসমঞ্জস ও সঙ্গতিপূর্ণ। জীবনটাই বড় কথা। জীবনের জন্য কবিতা। ইস্ট কোকারে লেখেন তিনি মারাত্মক স্বীকারোক্তি "the poety does not matter"। অ্যাস ওয়েডনেসডে নিঃসন্দেহে দান্তে প্রভাবিত। গির্জার বাচনভঙ্গী ধ্বনিত। তবু এলিয়টীয় "ট্রানসেনডেন্স"-এ এ্যাস ওয়েডনেসডে যুগান্তকারী। বলা যেতে পারে এই হল 'পারগেটরি'।

রূপান্তরের রূপ আরও স্পষ্ট 'ফোর কোয়ারটেট্স'-এ। আগে এলিয়টের কাছে যে নক্ষত্র সমাজ ছিল প্রায় মুছে যাওয়া বসন্তের দাগ, যে গোলাপ বাগান আনতো বিবমিষা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুনিচয়ের প্রতি ছিল ঘোর বিরূপতা, সে এলিয়ট আর নেই। কেন বৃদ্ধ ঈগল তার পাখা বিস্তার করবে—এই ছিল যাঁর জিজ্ঞাসা এখন সেই ঈগল পাখা বিস্তার করেছে। জীবনবিরূপতা এখন হচ্ছে জীবন অন্বেষা। প্রশ্নের বর্শা ভোঁতা হয়ে গেছে। সংশয়ের ঘোর কেটে যাচ্ছে। একে হয়তো বলা যায় স্বর্গের তোরণ। দরজা প্রায় খুলছে।

তাই আশ্চর্য হবার কিছু নেই যখন দেখা যায় ফোর কোয়ারটেট্স্-এর চারটি কবিতার মুখ্য উপাদান প্রকৃতি ও মানব জীবনের চারটি আদিম রহস্য—পৃথিবী বাতাস জল ও আগুন। এই চারটি আদিম উপাদান মরমীয়াবাদের মন্ত্রে একত্রিত হয়ে রূপ নিয়েছে অনন্ত একটির, ঐক্যের। তাই মালটিপল সেলফ থেকে যে কবির যাত্রা সুরু তার পরিসমাপ্তি ইউনিটি অব সেল্ফ-এ।

কবিতায় দর্শনের ভূমিকা সম্পর্কে ভ্যালেরীর উক্তিকে খণ্ডন করতে গিয়ে প্রকারান্তরে তিনি ভ্যালেরীকেই স্বীকার করে নিয়েছিলেন, সেই এলিয়ট 'বার্ণ্ট নর্টন'-এ দর্শনকেই মুখ্য অবলম্বন করলেন। এ্যাস ওয়েডনেসডে-র ধর্মতত্ত্বীয় বচন ও বাচনভঙ্গী বিসর্জিত হল। বার্ণ্ট নর্টনের দার্শনিক সিদ্ধান্ত :

Time past and time future
Allow but a little consciousness
To be conscious is not to be in time
But only in time can the moment in the rose garden

The moment in the ambour when the rain beat
The moment in the draughty church at smoke bell
Be remembered, involved with past and future
Only in time is time Conquered.

সময়কে জয় করতে হবে সময়ের মধ্যে। ইতিহাসের মধ্যে। স্থানও কালের মধ্যে। যে অবজেকটিভিটি এলিয়ট কখনো ত্যাগ করেননি, আত্মিক অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করার জন্য তিনি খুঁজেছেন অবজেকটিভ কোরিলেটিভ, কোয়ার্টেট্‌সের যুগে সেই বাস্তববোধ তাঁকে আরও জীবন্ত, আরও এমপিরিক্যাল পর্যায়ে আনলো। সময় আর সময়হীনতা, এই মুহূর্ত আর অনন্ত তার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করতে হবে। এবং তা স্থাপিত হবে খৃষ্টীয় বিশ্বাসের পরিধির মধ্যে ও ইতিহাসের মধ্যে।

যোগসূত্র স্থাপন করতে যদি অতীত বর্তমান আর ভবিষ্যতকে গ্রথিত করতে হয় ঐহিক অভিজ্ঞতার মধ্যে তবে তা অবশ্যই করতে হবে ইতিহাসের পটভূমিতে। 'লিটল গিডিং'-এ এলিয়ট বললেন :

A people without history
Is not redeemed from time, for history is a pattern
Of timeless moments, so, while the light fails
On a winter's afternoon in a secluded chapel
History is now England
With the drawing of this Love and the voice of this Calling

ইতিহাস হল অনন্তের প্যাটার্ন আর অনন্তের মধ্যেই বর্তমান।

সময়, যা বরাবরই এলিয়টের কাছে জটিল সমস্যা, তাকে এই পর্যায়ে তিনি আনলেন আরও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষের মধ্যে। এবং সেই প্রত্যক্ষ প্রতীকী রূপ পেল জল আগুন মাটি আর বাতাসের অবলম্বনে।

হেরাক্লিটাসের উক্তি হল, 'Fire lives in the death of the earth, air lines in the death of the fire, water lives in the death of air and the earth in the death of water' চাকার মতো সব ঘুরছে। একটার মৃত্যু অন্যটির জন্ম দিচ্ছে। এই জীবন আর মৃত্যু চলেছে অনন্তের উদ্দেশ্যে, মৃত্যুর দিকে নয়, পূর্ণতার দিকে, জীবনের আরও ব্যাপক অভিব্যক্তির দিকে। ক্যালভিন আর লুথার জোর দিয়েছেন আসন্ন বিনাশের ওপর। ক্যাথলিকদের জোর বিনাশের ওপর নয়।

ব্যাপকতর অভিব্যক্তি করাল ও ভয়ঙ্কর। আবার কল্যাণময়, কমনীয়। ড্রাই স্যালভোজস্-এ এসেছে এই সময়। সেই কাল যা পালক ও সংহারক। বিশ্বরূপ দর্শণের অনুষঙ্গ তাই আনেন এলিয়ট। বিশ্বরূপ দর্শনে ভয় বিহ্বল অর্জ্জুন প্রার্থনা করেন, বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম। তখন কেশব তাঁর পরিচয় দিয়ে বললেন, আমি লোকক্ষয়কারী মহাকাল। এখন আমি লোকসমূহ সংহার করতে প্রবৃত্ত।—কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ। ড্রাই স্যালভেজেস্-এ আছে সমুদ্র আর নদী। এই সমুদ্র হচ্ছে মহাকাল। এই হল অন্তহীন সময়, এই অনন্ত, এই ইতিহাস। বিনাশের পর বিনাশের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে সৃজনের দিকে। সৃজন থেকে আবার বিনাশ। গ্রীকমতে সময় চক্রাকার। ভারতীয় মতেও তাই। প্রচলিত ব্যাখা অনুসারে খৃষ্ট মতে সময় রৈখিক। আবার অন্য আর একটি মত হল সময় ভারটিক্যাল। সে যাই হোক এই অনন্ত সমুদ্রের সঙ্গে কিন্তু নিরবধি চলেছে স্রোতস্বিনী। আর যে নদী চলে নিরবধি সে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সময় যার নাগাল আমরা সব সময় পাই। আর এই নাগাল পাবার অভিজ্ঞতা তখনই সত্যিকারের অভিজ্ঞতা হয় যখন আমরা তাকে দেখি সমুদ্রের পটভূমিতে। তাই সময়হীনতা ও অনন্তের উপলব্ধি সম্ভব সীমাবদ্ধ কালের মধ্যে যখন বিমূর্ত মূর্ত হয় বিশেষের মধ্যে। এই ভাবে হয় দুই বিরোধের সমন্বয়। এই ভাবে এমপিরিক্যাল সেলফ্, আর রিয়েল সেলফ; মালটিপ্লিসিটি অব সেলফ আর ইউনিটি অব সেলফ হয় একটি সেলফ। এই অনন্য পূর্ণতা এলিয়টের মুক্তি। এই তার উত্তরণ, তাঁর ট্রানসেনডেন্স। দান্তের প্যারাডিসি-য় তিনি আসেন নিজেকে নিষ্ঠুর ভাবে ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে, নিরলস শুদ্ধ আত্ম অন্বেষণের আগুনে পুড়ে পুড়ে।

সমকালীন আর একজন দিগ্‌দর্শী কবি, সা জন পার্স এই আদিম মৌল উপাদানকে করেছেন তাঁর থীম। এলিয়ট তার আনাবেস অনুবাদও করেছেন। তাঁর সমালোচনা প্রসঙ্গে ক্যাথলিন রেইন ঠিকই বলেছেন, "an element entirely absent from the writings of St Jhon Perse —the human as such." কিন্তু এলিয়ট সেই বিপদ এড়িয়ে যান।

তবু ফাঁক থাকে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জীবন তো এখনো বিমূর্ত, এখনো তা ধারনার মধ্যে যদিও অভিজ্ঞতালব্ধ। নিত্য তার ধুলো লাগেনি তার গায়ে। সেই অভাব পূর্ণ হয় এলডার স্টেটসম্যান-এর নায়ক লর্ড ক্লেভারটনের স্বীকারোক্তিতে:

If a man has one person, just one in his life
To whom he is willing to Confess everything...
Then he loves that person, and his love will save him.

এই প্রেম তার উজ্জ্বল উদ্ধার, তার ত্রাণ।

উদ্ধার এলিয়টেরও। রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ে :

অস্থিমালা গেছে খুলে মাধবী বল্লরী মূলে
ভালে মাখা পুষ্পরেণু—চিতাভস্ম কোথা গেছে মুছি
কৌতুকে হাসেন উমা কটাক্ষে লক্ষিয়া কবি পানে—

পরিণত বয়সে যে ব্যক্তিগত সচিবকে তিনি বিয়ে করেছিলেন সেই উমা সত্যিই এলিয়টের দিকে মুচকি হেসেছিলেন কি না—জানি না। শুধু জানি, এমপিরিক্যাল সেলফ পেল পূর্ণতা। এই ভালবাসা ভাবজগতের বিশুদ্ধ ধারণা নয়। দূরবর্তী বিয়াত্রিচে নয়। এই ভালবাসা ঐহিক, রক্ত মাংসের মাদকতায় পূর্ণ। এলডার স্টেটসম্যান তাঁর স্ত্রীকে, উৎসর্গীকৃত। উৎসর্গ পত্রে অকপট স্বীকারোক্তি

......the
Leaping delight
That quickens my sanse in our working time
And rhythm that governs that repose in our
sleeping time

এখানেই ইউলিসিসের যাত্রার শেষ। অপূর্ণতা থেকে পূর্ণে, মরু তীর থেকে সুধা শ্যামলিমায় এই ভাবে এলেন আমাদের যুগের অন্যতম ইউলিসিস কবি টি. এস. এলিয়ট।

॥ ৩ ॥

কাব্যনাটকের ক্ষেত্রে এলিয়টকে দিগদর্শী বলে মেনে নিতে আমরা অভ্যস্ত। প্রকৃতপক্ষে আমাদের সমস্ত ধারণা এলিয়টের বিভিন্ন রচনা এবং তার সমালোচনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ইয়োরোপে যে অন্য আদলে কাব্য নাটক রচনার প্রয়াস চলেছিল সেই সময়ে তার দিকে আমাদের নজর বড় একটা নেই।

এলিয়ট কবিতার ক্ষেত্রে আবেগ, স্বতঃস্ফূর্ততা, ইত্যাদির ওপর নির্ভর না করে ভাবনার প্রতি বাঁক তত্ত্বের গ্রানাইট পাথরের ওপর প্রতিষ্ঠিত

করেছেন এবং কাব্য রচনা করেছেন। অর্থাৎ কবিতা ও কবিতার তাত্ত্বিক ভিত্তি একই সঙ্গে কাজ করেছে। কাব্যনাটকের ক্ষেত্রেও তাই। সমালোচক বা তাত্ত্বিক মন কখনো তাকে ভুলে রাখেন নি।

প্রথম থেকেই দেখা যায় এলিয়টের কবিতা নাট্যগুণান্বিত। কখনো তা প্রকাশিত স্বগত আলাপে, টুকরো কাহিনীর চরিত্রে ও ইংগিতবহ সংক্ষিপ্ত সংলাপে। ফোর কোয়ার্টেটস্ ছাড়া বিখ্যাত সব কবিতাগুলি সম্পর্কে এই কথা বলা যায়। জাজ-এর ভিত্তিতে ক্রাইটেরিয়া পত্রিকায় দুটি টুকরো নাটক লেখার পর তাঁর বিশ্বাস হয় সে কাব্যনাটকে নূতন কিছু করা যায়। বিশেষ করে তাঁর সামনে ছিল ইয়েটস-এর পরীক্ষা নিরীক্ষা। এই বিষয়ে ইয়েটসের ভাবনাও সামান্য নয়। তার ওপর তিনি পেয়েছিলেন প্রয়োগ পটুত্বে খ্যাত পরিচালক ব্রাউনীর অকৃপণ সাহায্য। এ্যাংলিকান চার্চে যাবার পর খৃষ্টীয় উৎসব উপলক্ষ্যে 'দ্য রক' রচিত হয়। এখানে তিনি ব্যালে, মাইম, কোরাস ইত্যাদির সাহায্য নিয়েছেন। পরে ব্রাউনীর পরিচালনায় 'মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রাল' প্রযোজিত হয়। এলিয়টের সব কটি নাটকের পরিচালক তিনি। মনে পড়ে পঞ্চাশের দশকে অথবা ষাটের গোড়ায় ব্রিটিশ কাউন্সিলের নিমন্ত্রণে একটি দল কলকাতায় আসে। তার পরিচালক কি ছিলেন ব্রাউনী? নিউ এমপায়ারে এই দল সম্ভবত 'ককটেল পার্টি' ও 'কনফিডেনশিয়াল ক্লার্ক' অভিনয় করেন। সেই নাটক দেখার পর আমার মন ভরে নি। সাহেবের মুখের ইংরেজী। সব বুঝতেও পারিনি। এখনো আমার অনেক প্রশ্ন।

সত্যি, কাব্যনাটক বলতে এলিয়ট কি বোঝাতে চান? কবিতায় রচিত নাটক যা আগে রচিত হত? অ্যাকাডেমিক মহলে নাটকীয় কবিতা, দৃশ্যকাব্য, নাট্যকাব্য কাব্যনাট্য ইত্যাদি নানাবিধ বিভাগ আছে। পাত্রাধার তৈল না তৈলাধার পাত্র নিয়ে বিজ্ঞ তর্কের অন্ত নেই, সব বুঝতেও পারি না।

কিন্তু প্রশ্ন থাকে কেন কাব্যনাটক? আগে তো কবিতায় নাটক লেখা হতো। ইবসেন নিজেও রচনা করেছেন। তারপর সেই ইবসেন কবিতা, যা 'ল্যাংগোয়জ অব গডস্' ত্যাগ করে আমরা যেমন ভাবে বাঁচি তা দেখাবার জন্য গদ্যের আশ্রয় নেন। ইয়েটস-এর কথা থাক। তার নিজস্ব যুক্তি আছে। কিন্তু এলিয়টের যুক্তি কি? তিনি অনুভব করলেন সারেন্সী ব্লাঙ্ক ভার্স বা হিরোইক কাপলেট নতুন কাব্যনাটক লেখা

অসম্ভব। ইনটারনাল কমবাসান ইঞ্জিনের দৌলতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জীবন পালটে গিয়েছে। স্পীচ ভার্স'ও সফল নয়। আমাদের কথাবার্তার ছন্দ নিয়ে আসতে হবে। কবিতাকে নিয়ে যেতে হবে নীচু পর্দায়, এমন কি গোপন করতে হবে। ইত্যাদি ইত্যাদি। তা হলে কাব্যনাটক কি শুধুই প্রকরণগত? পাঠক ও দর্শকদের সুগারকোটেড কুইনাইন দিয়ে কবিতা শোনাতে হবে? তা সত্ত্বেও তাঁর অনেক জ্ঞানগর্ভ আলোচনা পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশ্লেষণ রস সম্মত তীক্ষ্ণ অভিমত যে কোন পাঠকের কাছে অমূল্য সম্পদ; আমার মতো অতি সাধারণ ছাত্রের কাছে তো কথাই নেই।

কিন্তু এই আলোচনা সহজে মিটবার নয়। আমি মনে করি কাব্য-নাটক ছন্দের মুক্তি বা কবিতায় নাটক নয়। একটা নতুন জাতের নাটক—যা এখনো নিতান্ত ভ্রূণ অবস্থায়। মানবসভ্যতার বিবর্তনের ধারা, যা কসমিকাইজেশন অব ম্যান-এর দিকে নিবদ্ধ, যা আণবিক সভ্যতার অনিবার্য প্রতিশ্রুতি, তারই শিল্পমাধ্যম কাব্যনাটক। বর্তমান অবস্থা তার টালমাটাল প্রস্তুতি পর্ব মাত্র।

এলিয়ট প্রথম যুগের নাটককে তাঁর ধারণার সমীপবর্তী নয় বলেছেন। তাঁর পক্ষপাত শেষের দিকের নাটকে যেখানে কবিতা আছে 'থীন ডায়েট'-এ। আমার মনে হয়েছে এ্যালডার স্টেটসম্যান এলিয়টের বিবর্তনের ধারায় যুগান্তকারী। কিন্তু মেলোড্রামা সত্ত্বেও ফ্যামেলি রিইউনিয়ন অনেক বেশি সার্থক কাব্য নাটক। যাই হোক, এ তো শুধু মতামত মাত্র।

কিন্তু যা সব মতামতের উর্ধ্বে তা হল অনুজের সশ্রদ্ধ প্রণাম॥

এলিয়ট : প্রসঙ্গ ঐতিহ্য, খৃষ্টীয় সমাজ ও সংস্কৃতি

তরুণ সান্যাল

মানুষের সমাজ বিষয়ে সমাজতাত্ত্বিকের যে দৃষ্টিভঙ্গী থাকে, সমাজ-বিপ্লবীর তেমনটি নয়। যাঁকে বলব রক্ষণশীল, পুরনো দিনের স্মৃতিতে যিনি তন্ময়, এমনকি পুরনো মূল্যবোধের উজ্জীবনই যাঁর কাম্য, তেমন ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যেও থাকে চলতি সমাজের নঞর্থক দিক-গুলিরও সমালোচনা। সে সমালোচনা সমাজবিপ্লবীরও কাজে লেগে যায়। কার্লাইল এক সময় বৃটিশ পুঁজি-বাদের অর্থগৃধ্নু ভূমিকাকে নিন্দা করেছিলেন তীব্রভাবে। কে না জানে ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে কার্লাইলের মূল্যায়ন। অথচ ফ্রেড্‌রিক এঙ্গেলস্ টমাস কার্লাইলকে বলছেন 'সত্যিকারের ভদ্রলোক'। মিল তো বলেই ছিলেন, কোলরিজের মতো রক্ষণশীল ব্যক্তিও কাম্য, কেননা তাঁর মতো বুদ্ধিজীবীদেরই হাতে আছে "বিস্মরণ থেকে সত্যকে বাঁচানোর স্বাভাবিক উপায়, যা টোরিরা ভুলে গেছে, আর চলতি উদারনীতিকেরা তা জানতোই না।" এলিয়টের ঢের আগেই কোলরিজ এক 'জাতীয়' চার্চের কথা তুলেছিলেন।

'রাজনীতিতে রাজতন্ত্রী, সাহিত্যে ক্ল্যাসিসিস্ট্ এবং রিলিজিয়নে অ্যাংলো-ক্যাথলিক' বলে নিজেকে চিহ্নিত করেই যেন এলিয়ট 'রক্ষণশীল' বিশেষণটি পেয়ে গেছেন। বলা বাহুল্য এলিয়টের দৃষ্টিভঙ্গীতে রয়ে গেছে তথাকথিত পশ্চিমী ডেমোক্রাসিগুলি বিষয়েই তীব্র ধিক্কার। এলিয়ট বিংশ শতাব্দীর মহাসঙ্কট-কালের কবি। প্রুফ্রক-ওয়েস্ট-ল্যাণ্ড থেকে ফোর কোয়ার্টেটস্ পর্যন্ত কবিতা আসলে মহাযুদ্ধকালীন কবিতাই। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হতে না

হতেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রস্তুতি। এবং অন্তর্বর্তীকালে ইতালীতে মুসোলিনীর ফ্যাসিবাদ, হিটলারের জর্মন নাৎসীবাদ ও স্তালিনের রাশিয়া এবং ১৯৩৬-৩৮-এর হিস্পানি গৃহযুদ্ধ। ১৯৩৯ সালে এলিয়ট লিখেছিলেন যে জর্মান ও রুশদেশ নিয়ে পশ্চিম ইউরোপীয় গণতন্ত্রগুলি নিন্দাবাদ করছে, দেখাতে চাইছে নিজেদের অনেক উন্নত বলে, এদের দেশেও আনুষ্ঠানিকভাবে কেউ খৃষ্টধর্ম অনুসরণ করলে অবশ্য কোনো রাষ্ট্রীয় বিধিনিষেধ তাতে নেই বটে, তবে যে মূল্যবোধগুলির উপরে মানুষ বেঁচে থাকে, সেগুলিকে নির্লজ্জভাবে গোপন করা হচ্ছে। "We conceal from ourselves the unpleasant knowledge of real values by which we live." মিউনিকের পরে, (এমনকি হিস্পানি গৃহযুদ্ধে ফ্যাসিস্টদের বিজয় অভিযানের পর্বে) বৃটিশ সরকারের নোংরা ভূমিকা নিয়ে নানা ফ্যাসিবাদবিরোধী ও সংস্কৃতিমনা ব্যক্তিদের সমালোচনা যতই স্বাভাবিক বলে মনে হোক না কেন আসলে তো তা "It was not, I repeat, a criticism of the government, but a doubt of the validity of a civilization...was our society, which had always been so assured of its superiority and rectitude, so confident of its unexamined premises, assembled round anything more permanent than a congeries of banks, insurance companies and industries, and had it any beliefs more essential than a belief in compound interest and the maintenance of dividends?"

রাষ্ট্রবাদের দাপট আর পুঁজির দাপটের মধ্যে গুণগত তফাৎ কোথায়? আসলে সতীত্ব, নিষ্ঠা, দয়া-মায়া, বিনয়, কৃচ্ছ্রতা, এসব লোপ পেয়ে গেছে পুঁজির দাপটে। মানুষ তার জীবনের কোন উদ্দেশ্য বিষয়েই আর অবহিত নয়, তার জানবার ইচ্ছাও নেই। এক প্রবল প্রবাহে সে ভেসে চলেছে। এই ভাসমান, মূল্যবোধ বিষয়ে অজ্ঞ মানুষের সমাজ উদ্ভবের জন্য দায়ী তার শিকড়চ্যুতি। এলিয়টের মতে সে শিকড় ছিল রেনেসাঁসপূর্ব কালে। ব্যক্তি-স্বার্থবাদী যে মানুষকে জন্ম দিয়েছে রেনেসাঁস, সেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী 'হিউ-ম্যানিজম' এই অধঃপতনের জন্য দায়ী। আর, তাই বর্তমান প্রেক্ষিত মনে রেখেও, এলিয়ট আকাঙ্ক্ষা করেন এক খৃষ্টীয় সমাজ রচনা "in which there is a unified religious—social code of behaviour"। এমন সমাজে মানুষের উদ্দেশ্যও থাকবে, "in which the natural end of man—

virtue and well-being in community—is acknowledged for all, and supernatural end—beatitude—for those who have the eyes to see it." (The Idea of a Christian Society)। খৃষ্টের খৃষ্টীয় সমাজ আসলে প্রত্যক্ষ কৃষি উৎপাদন ও মৎস্যচাষের উপর নির্ভরশীল। তার সঙ্গে নির্বিবেক ও উৎপাদনের ফল থেকে বিযুক্ত ব্যক্তির কোন সম্পর্ক নেই। ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পশ্রমিক এবং 'মাথার ঘাম পায়ে ফেলা' সরল উৎপাদনের উপকরণে নিযুক্ত কৃষক, বা মৎস্য-চাষী, ছুতোর বা কামারের মধ্যে ফারাক রয়েছে আসমান-জমিন। ম্যানুফ্যাকচারিং-এর জগৎ ও খৃষ্টীয় সমাজের সরল উৎপাদনের জগতের মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য নেই। আধুনিক শিল্প অধ্যুষিত দেশে, মুনাফার তাড়নায় জীবনপাত, সমাজের উদ্দেশ্যই যেখানে মুনাফা, সেই দৃষ্টিভঙ্গী মেনেও নেবো এবং খৃষ্টানও থাকবো এই গোঁজামিল চলে না। উপরন্তু মানুষের প্রয়োজনমাফিকই প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার হবার কথা, সে সম্পদ-তছনছ (exploitation) করা নয়। "...the motive of Profit into a social ideal, the distinction between the *use* of natural resources and their exploitation, the use of labour and its exploitation, the advantages unfairly accruing to the trader in contrast to the primary producer, the misdirection of the financial machine, the iniquity of usury, and other features of a commercialized society which must be scrutinized on Christian principles...the organization of the society...is leading both to the deformation of humanity...to the exhaution of natural resources...our material progress...for which succeeding generations may have to pay dearly". (The Idea of a Christian Society)

এলিয়ট দেখছি লাগামছাড়া শিল্পায়নের সমালোচক। সমালোচক তিনি ভোগবাদী মুনাফাগৃধ্নু সমাজ দৃষ্টিভঙ্গীর। শ্রমিকের বিযুক্তি ঘটেছে প্রকৃতির সঙ্গে, ঘটেছে সমাজের সঙ্গে, উৎপাদনের সঙ্গে, ঘটেছে তার আপন সত্তার সঙ্গে। অথচ প্রাক্-রেনেসাঁস সমাজে এই বিযুক্তিগুলি এত তীব্র ছিল না। রেনেসাঁস-পূর্ব কালের পরস্পর নির্ভরশীলতার মূল্যবোধ, তার সঙ্গে শোষণহীন অবস্থান যদি যুক্ত করা যায়, তবে যে সমাজ গড়ে উঠবে, সে সমাজ হবে অনেক বেশি ন্যায়পরায়ণ। ঐহিক ও আত্মিক দুই লক্ষ্যই

সেখানে চরিতার্থ হবে। প্রজাপুঞ্জের নামে শাসন করতে এসে, গণতন্ত্রের অভিধায় যা পুঁজিরই শাসন, তার চেয়ে ঢের ভালো পার্লামেণ্টহীন রাজন—যে রাজা খৃষ্টীয় নীতি নিয়মগুলির নিরিখেই শাসন করবেন। রাষ্ট্র সেখানে গুরুত্বপূর্ণ নয়, সমাজই সেখানে গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ এলিয়ট তাঁর নৈরাজ্যবাদী বন্ধু হার্বার্ট রীডের অগ্নিক্ষরা প্রচার পুস্তিকাগুলি পড়েও ভিন্ন ধরণের এক নৈরাজ্যবাদেরই ইঙ্গিত দেন।

এই সমাজের ভাবনার সঙ্গে এলিয়টের ঐতিহ্যবাদ ও নন্দনতত্ত্বও সম্পর্কিত।

ওয়েস্টল্যাণ্ড রচনার যুগে এলিয়ট নাকি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন মনে মনে। বলেছিলেন তা গ্যাব্রিয়েলা মিস্ত্রালকে। কেন? বাসনা বিযুক্ত নির্মোহ মানুষ যে নির্বাণ খোঁজে, সেই লক্ষ্যই ছিল তাঁর তখন অন্বিষ্ট। এবং সেই নির্বাণের মধ্যেই রয়েছে একটি স্থিরকেন্দ্র যে কেন্দ্রের চতুর্দিকে মহাজাগতিক নৃত্য চলেছে। এমনি জীবনেও চাই, গর্জমান ও রণচণ্ডী প্রবাহ নয়, শান্ত জীবন ও শান্তি। এ শান্তি একটি স্থিত সমাজেই সম্ভবপর। এমন সমাজ এলিয়টের মতে প্রাক্-রেনেসাঁস মধ্যযুগের সরল জীবনেই দেখা গেছে। সাহিত্যেও আছে তার মহিমার বিশেষিত রূপ। যেমন দান্তের ডিভাইন কমেডি। জীবনে যে শিকড়ের প্রয়োজন আছে, সমাজেরও প্রয়োজন যে নোঙরের, তা যেন ভার্জিলের রচনায় বিধৃত। ট্রয়ের রণস্থলী নয়, ওদেসিউসের ভূমধ্যসাগরের সার্সি-সাইরেন-সাইক্লপস অধ্যুষিত দ্বীপে দ্বীপে পেনেলোপি-টেলিমিকাসের ইথাকা খোঁজা নয়, বরং ইনিয়াডের লক্ষ্য রয়েছে এক দেশ গড়ার, নিরুদ্দেশ জীবন নয় তার। ভার্জিল এই কর্তব্যবুদ্ধিতে দৃপ্ত পুরুষকারকে সৃষ্টি করেছিলেন যেমন, প্রাক্-খৃষ্ট সমাজের সেই মহিমা নিয়ে ডিভাইন কমেডির পথপ্রদর্শক ভার্জিল দান্তেকে নিয়ে যান কামনা-বাসনা ছাই করে শুদ্ধ প্রেমের নন্দনলোক পারাদিসোতে। দান্তে রোমান্টিকদের 'বেদনাই সবচেয়ে মধুর গীতি শোনাবে'-র মতো কিছু বলেন না। এ রোমান্টিকতা রেনেসাঁস-উত্তর ব্যক্তির বোধ। এ রোমান্টিক বোধ প্রকৃতি, সমাজ-স্বজন ও নিজের থেকেও চ্যুতিসম্ভব। চ্যুতি এ বেদনা-বোধের উৎস। বরং পূর্ণ আনন্দের উৎসার জন্ম দেয় সেই মহিমাময় সরলতার, যা কেবল আলোকপ্রাপ্ত এলিটিস্ট সাহিত্য শিল্প নয়। বরং শিকড় তার প্রোথিত সাধারণ মানবযাত্রায়। সাহিত্য এজন্যই ক্লাসিক হওয়ার কথা। এ সমাজে এলিয়টের শিকড়ও ঐ মানব যাত্রার অন্তর্গত।

ভার্জিলের সমাজ কি হোমারের সমাজের চেয়ে খুব উন্নত ছিল? না। বরং "The Rome of the imperial era was coarse and beastly enough; in important respects far less civilized than Athenes at its greatest. The Romans were less gifted than Athenians for the arts, philosophy and pure science; and their language was more obdurate to the expression of either poetry or abstract thought." (Virgil and the Christian World)। তবে, দুটি সভ্যতা তুলনা করলে, এলিয়টের মতে ভার্জিলের বিশ্ব ছিল হোমারের বিশ্বের তুলনায় সম্মানবোধ, যুক্তি ও শৃঙ্খলায় অনেক বেশি সুসভ্য। ভার্জিল তো সেই সভ্যতারই সন্তান, যে সভ্যতায় তিনি জীবিত ছিলেন। এই রোমান সভ্যতার নিষ্কাশিত যে রূপ, এলিয়টের মতে, তা থেকেই যাকে আমরা 'খৃষ্টীয় সভ্যতা' বলি তার উদ্ভব ঘটেছে। এবং এই খৃষ্টীয় সভ্যতা যে দীর্ঘকালীন ভারসাম্য দিয়েছে, তাতেই উদ্ভব ঘটেছে দান্তের মতো মহা-কবির। বলা বাহুল্য, ঐতিহ্য ও ব্যক্তিপ্রতিভার সম্পর্ক বিচারে এলিয়টের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বলা যায়, রোমান সভ্যতার ঐ কবির গ্রীক ইতিহাস আত্তীকরণ, এবং নিজ কালের ইতিহাসের প্রেক্ষিতে গ্রীক ইতিহাস মূল্যায়ণ তাঁকে স্বকালের শ্রেষ্ঠ মহিমায় অলঙ্কৃত করেছে।

এলিয়ট বলছেন, দান্তে আর শেক্‌সপীয়র বর্তমান বিশ্বকে ভাগাভাগি করে নিয়েছেন। তবে শেক্‌সপীয়র দিয়েছেন "Greatest *width* of human passion; Dante the greatest altitude and greatest depth." দান্তের কাছে ছিল সেইসব রূপক বা allegory, বিশ্বাস ইত্যাদি "That is the advantage of a coherent traditional system of dogma and morals like the Catholics: it stands apart, for understanding and assent even without belief, from the single individual who propounds it." এতে মানুষ ও কবি দান্তেকে মিলিয়ে নেওয়া যায়। উপকরণগুলিকে বিশ্বাস না করেও, উপকরণের নিজের অর্থেই কাব্য সৃষ্টি হতে পারে তখন। তবে দান্তে কি উপকরণগুলিকে অবিশ্বাস করেই, এসব মহৎ বিশ্বাসের কাব্য লিখতে পারতেন? গ্যয়টের কথা প্রসঙ্গ, এলিয়ট তুলেছেন। তিনিও তো Sturm und Drang-এর যুগের রোমান্টিক কবিই। গ্যয়টে নিজ বিশ্বাস বলে যা ঘোষণা করছেন, এলিয়টের তাতে সংশয় হয়। কেননা, ঐ রোমান্টিক কবির এ উপকরণগুলি

সন্ততন, ব্যক্তির চারিত্রগঠন ঐ উপকরণগুলি দিয়ে হয়নি, নিছক এগুলি গ্যয়টেরই সৃষ্ট। "Goethe always arouses in me a strong sentiment of disbelief in what he believes : Dante does not...Dante is the purer poet." গ্যয়টের বিশ্বাস তো ব্যক্তির। স্থিতসমাজের তা অন্তর্গত নয়। যে অন্তর্গত সত্য যুগের কবিকে মহিমা দেয়, স্বাভাবিকভাবে সত্যসন্ধ করে, গ্যয়টে তো তেমন সমাজে বাস করেননি। এলিয়টের মনে হয়েছে, তাঁর বিশ্বাসগুলি তাই বানানো। এলিয়টের দান্তের রাজনীতিও মনে রেখেছেন। মানুষের অসম্পূর্ণতার জন্তেই মানুষের প্রয়োজন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সংগঠন। কার্যত এখানেও এলিয়টের রয়েছে ঈশ্বর অন্বেষণ, beatitude. একটি স্থিতিশীল ঐতিহ্য এমন কিছু রূপকের সৃজন ঘটায় যে, "allegorical method has great advantages for writing of poetry" : এই allegory-র দাক্ষিণ্যেই কবিতাটির অর্থ বুঝবার আগেই আমরা কবিতাটি উপভোগ করতে পারি। সাহিত্যে স্থিতিশীল ঐতিহ্যের গুরুত্ব এতটাই বেশি। এবং এই স্থিতিশীল ঐতিহ্য সাধনাই এলিয়টের মতে ক্লাসিক সাহিত্যের উদ্ভব ঘটায়। কেননা ক্লাসিক সাহিত্য সৃজনের জন্য প্রয়োজন পরিণত মন, (maturity of mind)। এই পরিণত মনের জন্য জরুরী—যে জাতিগুলির ইতিহাস কবির ঐতিহ্যকে পুষ্ট করেছে সেই ইতিহাস বিষয়ে জ্ঞান, এবং তার সঙ্গে দরকার আঞ্চলিকতাবোধ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে ওঠা, এবং উপকরণেরও পরিণত হয়ে ওঠা। তাছাড়া ক্লাসিক সাহিত্যে থাকে, সাধারণ রচনারীতি এবং তার সঙ্গে জরুরী রয়ে যায় ভবিষ্যৎ বিষয়ে আস্থা ("If we cease to believe in the future, the past would cease to be fully *our* past : it would be past of a dead civilization")। তার সঙ্গে থাকে অবশ্য বিশ্বাসযোগ্যতা ও সর্বজনীনতা। অর্থাৎ অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতে রয়ে যায় এক পারম্পর্য। একটি আরেকটি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। "Time present and time past/ Are both perhaps present in time future." কিন্তু যে সভ্যতা কেবল টলছে, এলোমেলো পা ফেলছে, তা কি ক্লাসিক সাহিত্যের উদ্ভব ঘটাবে? না। আধুনিক সাহিত্যে ধ্রুপদী কিছু গড়ে ওঠার নয়। স্থিতিশীল জীবন ব্যতীত ক্লাসিকও সৃষ্ট হবার নয়। তা মনে maturity আনেনি বলেও।

ব্যক্তিগত প্রতিভার ভূমিকাটিও এ প্রসঙ্গে তখন স্পষ্ট। কোনো বড়

কবির সবচেয়ে প্রয়োজন ইতিহাসের বোধ। আর এই ইতিহাসবোধটি যেমন কালসীমানাহীন তেমনি তেমনি কালসীমানায় সীমায়িত, আবার "of the timeless and of temporal together, is what makes a writer traditional." আর সাহিত্যের একটি নিজস্ব ধারা পরম্পরা আছে (order), যে-কোনো নতুন রচনা ঐ ধারানুসারী হবার কথা। এ হলো নতুন সৃষ্টিকে পুরনো সৃষ্টির চোখে দেখা। আবার যা নতুন সৃষ্টি হলো, তারও আলোয় পুরনোকেই দেখতে হবে। এভাবেই timeless এবং temporal এক বৃন্তে ধরা পড়ে। আর তাই timeless-এর বিশ্বে নিজেকে যুক্ত করাটা "turning loose of emotion" দিয়ে হবার নয়, বরং "escape from emotion" : ঐতিহ্যের সঙ্গে মিলে যেতে হলে প্রয়োজন expression of personality নয়, escape from personality, আর ভালো কবিতা হয়ে ওঠে "an expression of siguificant emotion, emotion which has its life in the poem and not in the history of the poet." (Tradition and Individual Talent) অর্থাৎ, দান্তেকে বুঝতে যে আমাদের সুবিধা হয়, তার কারণ ঐতিহ্য থেকে যিনি উপকরণগুলি নিয়েছেন বলে। উপকরণগুলি নিজেরাই বিশেষ বিশেষ আবেগের উৎস তখন। এবং দান্তে বড কবি বলেই তিনি ঐ উপকরণ মাফিক বিশিষ্ট আবেগের বিকাশ ঘটিয়েছেন, কিন্তু সে আবেগ ব্যক্তিগত নয়, বরং সকলেরই চেনা জানা। এভাবেই ব্যক্তিগতভাবে কোনো লেখক ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান।

কবি যখন একটি কবিতা ঠিকঠাক লিখছেন, তাৎক্ষণিক আবেগকে সঙ্গী করে লেখা উচিত নয় তা। বা উচিত নয় নিজের ব্যক্তিত্বের সীমাবদ্ধ-তার দোলাচলমণ্ডিত সমাজের প্রেক্ষিতেও। কবি মুখ্য হয়ে সামনে চলে এলে তাঁর কবিতায় ঐতিহ্যসাধনাই নেই। মহৎ কাব্যের মহিমা সে কবিতা পায় না। বরং অতীত থেকে বাহিত হয়ে আসা স্থিতিশীল বিশিষ্ট আবেগ যখন উপকরণ, তখন তা তাৎক্ষণিক আবেগ থেকে উত্তীর্ণ, আবার তাৎক্ষণিক ব্যক্তিত্ব থেকেও তা মুক্ত—এজন্য সে কবিতা সর্বকালীন, অথচ স্বকালীন। এই স্বকালীন কবিতার তাৎপর্যে প্রাচীন কাব্যকে দেখা, এবং প্রাচীন কাব্যপাঠ থেকে আধুনিক কাব্যকে দেখা—দু কাব্যকেই উপভোগের নতুন মাত্রা দেয়। এলিয়টের কবিতায় এত যে পুরনো এমনকি সমকালীন কবিতার প্রসঙ্গ গোপন থেকে যায়, এখানেই রয়েছে তার ভিত্তি। এলিয়ট

এর জন্য তাঁর সাহিত্যের লক্ষ্য চিহ্নিত করতে গিয়ে নিজেকে বলছেন ধ্রুপদী, ক্লাসিসিষ্ট। এক দিকে স্বদেশের সভ্যতার তিনি অ্যাংলো, এবং প্রাক্-রেনেসাঁসস্থিত মানবিকতার গণ ও এলিট কাঠামোর সম্মিলনে ক্যাথলিক—অ্যাংলো-ক্যাথলিক। বৃটিশ ইতিহাসের বর্তমান, গ্রেকো-রোমান সভ্যতার মহিমা বাহিত খৃষ্টীয় সভ্যতার ইতিহাস—উভয়ের পারস্পরিক timeless ও temporal বিষয়ের সামঞ্জস্যে ট্র্যাডিশনের সঙ্গে সম্পর্কিত করতে চেয়েছেন এলিয়ট ইনডিভিজুয়াল ট্যালেন্টকে। তাঁর ফোর কোয়ার্টেটস-এর কবিতাগুলিতে রয়ে গেছে এর স্বতঃপ্রমাণ। কেবল ইউরোপীয় সভ্যতা নয়, শ্রীমদ্ভাগবত গীতা সেখানে যেমন অপ্রাসঙ্গিক নয়, অপ্রাসঙ্গিক নন এমনকি রুডিয়ার্ড কিপলিং। স্বাভাবিকভাবে এসে যায় মেরী কুইন অব দি স্কটস, বা নির্যাতিত সন্ন্যাসীরা, কিংবা পূর্বপুরুষের আদি ভদ্রাসন। বার্নট নর্টন (১৯৩৫), ইস্ট কোকার (১৯৪০), দি ড্রাই সালভুয়েজেস ও লিটল গিডিং (১৯৪২) এবং এই পারম্পর্যেই এলিয়টের সংস্কৃতি ভাবনা।

সংস্কৃতি ভাবনায় ব্যাপারে সমাজের প্রেক্ষিতই এলিয়ট বিচার করেছেন। 'নোটস টুয়র্ডস দ্য ডেফিনিশন অব কালচার' (১৯৪৮) নিবন্ধে 'সচেতনভাবে' এমন কোনো সমাজ গড়া যায়, যার লক্ষ্য চারুশিল্প বিকাশ, এমন উদ্দেশ্য তিনি মানতে পারছেন না। লেটার্স অব জন স্টুয়ার্ট মিল-এর একটি বিশেষ অংশে তিনি যা ভাবছেন, তাই বিকশিত হয়েছে ঐ নোট্স-এ। সমাজকে এমনভাবে সংস্কার করা যায় না, যেখানে এমন শর্ত দেখা দেবে যে চারুশিল্পকর্ম বিকশিত হবে। এলিয়টের মতে 'সম্ভবত' চারুশিল্প সমাজের উপ-উৎপাদন, যার জন্যে কোনো সমাজ ও চারুশিল্পের মধ্যে সচেতন শর্ত গড়া যায় না। বরং বিপরীতভাবে বলা যায়, শিল্পকর্মের অধঃপতন সমাজের কোনো না কোনো ব্যাধির জন্যেই ঘটে। সে সামাজিক ব্যাধিই অনুসন্ধান করা দরকার। "You cannot, in any scheme for the reformation of society, aim directly at a condition in which the arts will flourish: these activities are probably byproducts for which we cannot deliberately arrange the conditions. On the other hand, their decay may always be taken as a symptom of some social ailment to be investigated." বরং কোনো স্পষ্ট উদ্দেশ্য ঘোষিত না হলেও, মুনাফার লক্ষ্যে সংগঠিত তথাকথিত সমাজিক

গণ-সমাজ বা mass society-তে নিঃশব্দে এমন প্রভাব কাজ করতে থাকে যে যার ফলে শিল্প ও সংস্কৃতির স্পষ্ট অবনয়ন ঘটে। বিজ্ঞাপন আর প্রচারের ক্রমবর্ধমান সংগঠন—বা মনীষা ব্যতীত যে কোনো উপায়ে জনগণকে প্রভাবিত করা—এসব কিছুই ঐ শিল্প ও সংস্কৃতির শত্রু। সে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও শিল্প-সংস্কৃতিবিরোধী। এমনকি সমাজে যারা সরকারী ও বেসরকারীভাবে একদা চারুশিল্পকর্মের পরিপোষক ছিলেন তাঁদের নিঃশেষ হয়ে যাওয়াও এই বিরোধী অবস্থার সৃজনের আরেকটি দিক। অর্থাৎ মুনাফার তাড়না এবং শিল্পসাহিত্য-রসিক পরিপোষক ব্যক্তিদের অনুপস্থিতি জন-সংস্কৃতির (mass-culture) পর্যায়ে শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষয় হয়ে যাওয়ারই ইঙ্গিত দিচ্ছে। ইনডাস্ট্রি বিকশিত ভোগ ও উৎপাদন চক্রের মাঝপথে মুনাফা হাতিয়ে নেওয়া সমাজের নতুন মাথা, মাথা ব্যক্তি সমাজে শিল্প-সংস্কৃতির বিনাশই চায়। বলা বাহুল্য খৃষ্টীয় সমাজের বিষয়ে লিখতে গিয়ে এলিয়ট যন্ত্রশিল্প বিকশিত সমাজে যে মানুষের বিযুক্তি লক্ষ্য করেছেন, কার্যত সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনায় একই চিন্তার সাক্ষ্য রেখেছেন।

এলিয়টের চোখে পশ্চিম ইউরোপে কালচার শব্দটির অর্থ ঠিক এক রকম নয়। বৃটিশ culture আর জর্মান kultur-এ তফাৎ আছে। বৃটেনে কালচার শব্দটি অনেকটা অংশকে দিয়ে পুরোটা বোঝাবার মতো Synec-hdoche অলঙ্কারের মতো। আবার আবেগ উদ্দীপন বা আবেগ অসাড় করে দেওয়ার মতো উপকরণও তা। "...in general, the word is used in two ways by a kind of a synechdoche, when the speaker has in mind one of the elements or evidence of culture such as art, or as in the passage (Article which defines the purpose of the Unesco) as a kind of emotional stimulant, or anaesthetic."

এলিয়টের মতে অবশ্য জীবনযাপনের পুরোটাই কালচার। অর্থাৎ 'a whole way of life' এবং জনগণের সমস্ত ধরণের কাজকর্ম এবং যা তাদের অনুরাগ বিধৃত। তার মধ্যে বৃটেনের জনজীবনে 'Derby day, Henry Regatta, cowes, the twelfth of August, a cup final, the dog races, the pin table, the dart board, Wensleydale cheese, boiled cabbage cut into sections, beetroot in vinegar,

nineteenth century Gothic Churches, and the music of Elgar" —এসব কিছুই তাদের বর্তমান কালচারে আছে। অর্থাৎ অশনে বসনে আচরণে খেলাধূলায় সংগীতে জলসায় স্থাপত্যে আড্ডায় জাতীয় উৎসব অনুষ্ঠানে সব কিছু নিয়েই বৃটেনের জন (mass) সংস্কৃতি। সম্ভবত, স্টক এক্সচেঞ্জ, কয়লা খনির কাজ, শহরের যানবাহন সব কিছুই এর মধ্যে পড়ে। কিন্তু এলিয়ট লক্ষ্য করছেন, এসবের মধ্যে গুরুত্ব পাচ্ছে না পুরনো সংস্কৃতির ধারণা, অর্থাৎ শিল্পকর্ম, দর্শন ইত্যাদি। পুরনো দিনের বিশেষিত 'সংস্কৃতি' এবং এই 'জনপ্রিয় সংস্কৃতি' বা পপুলার কালচারের মধ্যে তফাৎ হয়ে গেছে। এবং এই জনসংস্কৃতি কার্যত 'religion, arts, learning' থেকে চ্যুত হতে হতে শেষে পর্যন্ত 'no culture'-এই দাঁড়াচ্ছে শেষ পর্যন্ত। কিন্তু religion, arts, learning আগেকার দিনে কালচারেরই অন্তর্গত ছিল, সব মানুষের জীবনধারার মধ্যে সমাজের মধ্যে। এই 'এলিট' সংস্কৃতিকে ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা শ্রেণী কিংবা পুরো সমাজের বিকাশের তাৎপর্যে দেখেছেন এলিয়ট।

সংস্কৃতি বিকাশের ইতিহাসে আনুভূমিক স্তর-পরম্পরার দিকটিই ভেবেছেন এলিয়ট। সমাজের উচ্চকোটি সমাজের একটি বিশেষ স্তরও ঐ সংস্কৃতি অংশটুকু রক্ষা করেছে আগে। "And the class itself possesses a function, that of maintaining that part of the total culture of the society which pertains to that class. We have to try to keep in mind, that in a healthy society this maintenance of a particular level of culture is to benefit, not merely of the class which maintains it, but of the society as a whole." উচ্চকোটির ঐ কালচারের বিশেষ দিকগুলি বাঁচিয়ে রাখার ভূমিকাকে গুরুত্ব দিয়ে দেখলে স্পষ্ট হবে, ঐ উচ্চকোটিও দায়িত্ব পালন করেছে। তারাও ছিল সমাজের গুণ লক্ষণের গৌরব রক্ষায় functional। এই বোধটি থাকলে সমাজের উচ্চকোটির সংস্কৃতিকে সমাজের কাছে অর্থহীন তো মনে হবেই না, বরং মনে হবে, এ সংস্কৃতি সবার মধ্যে তাৎক্ষণিকভাবে ছড়িয়ে যাবারও নয়। অর্থাৎ সমাজে রিলিজিয়ন, দর্শন, শিল্পকলা নিয়ে যাঁরা 'উচ্চ' সংস্কৃতি রচনায় ব্যস্ত, তাঁদের কাজটি তাঁদের জন্যেই নয় কেবল। তাঁদের কর্মটি একটি মানদণ্ডও। যার দিকে নীচু তলার মানুষ উঠতে চায়। যা সব মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। আর ঐতিহাসিক স্তরপর্যায়ে ঐ উচ্চকোটির

সংস্কৃতিই স্বীকৃত সংস্কৃতি বলে পরিগণিত হয়। এই সংস্কৃতির উচ্চকোটির এলিটদের অবশ্যই তাই সামাজিক ভূমিকা রয়েছে (social function)।

কিন্তু সংস্কৃতিরও দুটি স্তর রয়েছে। একটিতে রয়েছে অচেতনভাবে সাঙ্গীকৃত। আর একই সচেতনতা সৃষ্ট অংশও, রয়েছে রিলিজিয়ন, নৈতিক ভালোমন্দের নিয়মকানুন, আইন ব্যবস্থা, সচেতন শিল্পকর্ম। সুতরাং ঐ অচেতন অংশটিইতো whole way of life-এর স্রষ্টা। উচ্চ শ্রেণী 'গোষ্ঠী'র মধ্যে ঐ whole way of life-ই বিশেষিতভাবে বিকশিত। এজন্য আনুভূমিক সমাজেও শেষ পর্যন্ত সাংস্কৃতিক সংঘাত নেই। উচ্চকোটির শিল্পের প্রাণরস ব্যাপ্ত নির্জ্ঞানেরই অন্তর্গত। বর্তমান সমাজেও অজস্র ধরণের কাজকর্ম রয়েছে নানা গোষ্ঠীর। প্রতিটি গোষ্ঠীরই এলিট অংশ রয়েছে। এলিয়টের মতে আজকের দিনে যে সমাজের সব মানুষের সমপর্যায়ের সংস্কৃতি গড়বার ঝোঁক রয়েছে, বিশেষভাবে নানা জনদরদী গোষ্ঠীর নেতৃত্বে, সে ঝোঁক শেষ পর্যন্ত সংস্কৃতিবিনাশী। যদি উচ্চকোটি সমাজের অস্তিত্ব, শ্রেণীবিভেদ না থাকে, তবে শেষপর্যন্ত সমাজে সংস্কৃতিরই কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। অবশ্য এই উচ্চকোটি অংশটি জন্মদাক্ষিণ্যে গড়ে ওঠা উচিত নয়, তা হবে 'গুণকর্ম-বিভাগ' অনুযায়ী। আর সমাজে যদি সেই নির্জ্ঞানের ঐতিহ্য পরম্পরার অস্তিত্ব থাকে, তবেই উন্নত সংস্কৃতি গড়ে উঠবে। তিনি কোনো জাতীয় সর্বজনীন সমমান শিক্ষাব্যবস্থারও সমালোচক এক্ষেত্রে। বরং শ্রেণীহীন সমাজের চিন্তা ও জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা জীবনের ও সমাজের মূল্যবোধেরই অধঃপতন ঘটিয়েছে তাঁর মতে। এলিয়টের কাছে সুস্থিত সমাজই আকাঙ্ক্ষিত। ফলে, তিনি হয়ে পড়েন রক্ষণশীল। সমাজতন্ত্রী আন্দোলনের একেবারে উল্টো অবস্থান নেন তিনি।

এলিয়টের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিস্তৃত সমালোচনা রয়েছে নানা লেখকের। তিনি রাজতন্ত্রী, অ্যাংলো-ক্যাথলিক ও ধ্রুপদী সাহিত্যে বিশ্বাসী বলে নিজেকে চিহ্নিত করেছেন বলে বহু সমালোচক তাঁকে রক্ষণ-শীলভাবেই চিত্রিত করেছেন। তবু, পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই কি কমিউনিস্ট বা কমিউনিস্টবিরোধী, নানা ধরণের কবি, শিল্পী ও সংস্কৃতি-মনা ব্যক্তির কাছেই তিনি কোনো-না-কোনোভাবে পৌঁছেছেন। মার্কসবাদে বিশ্বাসী বলে পরিচিত বিষ্ণু দে তো ছিলেন তাঁর বিশেষ অনুরাগী এ রাজ্যে।

আমার মনে হয়েছে নানা জনের কাছে গ্রাহ্য হবার জন্যে, এলিয়টের

পশ্চিমী পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্তঃসারশূন্যতা বিষয়ে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়াটাই ছিল মূল কারণ। রেনেসাঁসের মানুষ, বা মানবতা-বোধে উদ্দীপ্ত মানুষ বিষয়ে তাঁর সমালোচনাও একপেশে। এমনকি খৃষ্টীয় সমাজ-বিষয়ক মধ্যযুগীয় স্থিতিশীলতার ধারণাটিও তাই। ইউরোপেও গোটা মধ্যযুগ ব্যেপে নানা সময়ে নানান কৃষক ও কারিগর গোষ্ঠী ঐ 'whole way of life' মনে রেখেই খৃষ্টানুসরণে বিদ্রোহ করেছে। দান্তের সৌন্দর্যবোধ নিছকই ব্রুনো-ল্যাটিমার-ক্রানমার-জোয়ান অব আর্ক পোড়ানো মধ্যযুগীয় স্থিতিশীলতার ধারণা নয়। বরং, প্রাক্-খৃষ্টান ভার্জিলই তাঁকে পথ দেখান। এবং রেনেসাঁসের জন্যে যাঁরা রাস্তা কাটছিলেন দান্তেও তাঁদেরই অন্যতম। আর সেজন্য লাতিন থেকে চলে এসেছিলেন তিনি লোকসাধারণের ভাষায়। এমনকি 'যথার্থ খৃষ্টীয় জীবন' সমগ্র সমাজকে শ্রেণীহীনতায় চিহ্নিত করে বলে মনে করেছিলেন টমাস মুনৎসার-পন্থী কৃষক বিপ্লবীরা জর্মানীর কৃষকযুদ্ধে। সভ্যতার আদিকাল থেকে সমসমাজের যে চিন্তা আবর্তিত হয়ে এসেছে, তার রূপ মধ্যযুগেই জর্মন তাত্ত্বিক অ্যাণ্ড্রিয়াস; বৃটিশ বিপ্লবী জন বল, রোমান যাজক কাম্পানালা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। এমনকি আরভিং ব্যাবিট সম্পর্কেও তাঁর চিন্তা একপেশে। রেনেসাঁস-এর এক ধারা পুঁজিবাদে এসেছে বটে, আরেকটি ধারা তো সমাজতন্ত্রেই বিকশিত হয়েছে। সুতরাং তাঁর খৃষ্টীয় সমাজের ধারণায় যে স্থিতাবস্থা গতরখাটা চাষ-আবাদ বা মাছ ধরার মধ্যে কেন্দ্রীভূত, নতুন শ্রেণীহীন সমাজতন্ত্রের সমাজে মানুষ তা ছাপিয়ে ঢের উঁচুতে উঠে বিযুক্তিগুলিকে দূর করে এবং উন্নত সংস্কৃতি সৃজন করে, যা whole way of life-ই বটে। কিন্তু এ সমাজে উচ্চ-নীচ অবস্থানের আনুভূমিক সমাজস্তর থাকে না। এলিয়টের সমাজভাবনায় আমরা শরিক নই, কিন্তু তিনি আমাদের ভাবান। সম্ভবত, এক ধরণের রক্ষণশীল অথচ নৈরাজ্যবাদী চিন্তা তাঁর ভেতর কাজ করে। তাঁর স্থির কেন্দ্রের আকাঙ্ক্ষা যে সমাজকেও এক গতিহীন অবস্থান দিতে চায়, সেখানেই আমাদের আপত্তি। তাঁর ঐতিহ্যসাধনাও পশ্চিমী ইউরোপীয়; সে ধারার সঙ্গে বিশ্বমানবযাত্রার সম্পর্ক খুবই ক্ষীণ। ভারতীয় বা চৈনিক, কিংবা শ্লাভোনিক মধ্যযুগ পশ্চিম ইউরোপ থেকে যথেষ্ট আলাদা। বরং ভারতে 'রিলিজিয়ন' ও 'ধর্মে' যথেষ্ট তফাত রয়ে গেছে। এলিয়টের ভারতীয় দর্শন পাঠ বা সংস্কৃত শেখার অভিজ্ঞান সে বোধ তাঁকে দেয়নি। বিদ্বান, উচ্চ-

কোটি সংস্কৃতি অভিলাষী, এবং শিল্পবিপ্লবজাত সমাজকে মানুষের জীবন চরিতার্থতার বিরোধী বলে উচ্চকণ্ঠ, এলিয়টের কেবল ব্রাডলীর কাছেই নয়, বা ভাববাদী দার্শনিকদের কাছে শিক্ষা নেওয়াই নয়, বস্তুবাদী দার্শনিকদের সঙ্গেও তাঁর যথেষ্ট পরিচয়ের প্রয়োজন ছিল। এবং দেশে দেশে মানুষের মুক্তি-সাধনারও। পুঁজির শাসন, মুনাফার আকাঙ্ক্ষাই ইনডাস্ট্রিভিত্তিক সভ্যতার শেষ কথা নয়। উন্নত ও ভিন্নতর সমাজও গড়ে ওঠার তা ভিত্তি। এলিয়টকে কিন্তু উপনিবেশ মুক্তির তিক্ত সংগ্রামের পাশে দেখছি না আমরা। বরং কেউ কেউ তাঁকে এলিটিস্ট ভেবে ফ্যাসিস্টও মনে করেছেন। আমরা তা অবশ্য ভাবছি না। কিন্তু তাঁর মধ্যে কি গোপনচারী ইহুদী বিদ্বেষ ছিল? তাঁর রচনায় ইহুদী নামগুলি ছোট অক্ষরে লেখা হয় কেন? দুই যুদ্ধের মধ্যবর্তী দানবীয় ফ্যাসিস্ত আগ্রাসন বিষয়ে তিনি তেমন সোচ্চার নন কেন? এসব কথা বহু পাঠকের মনে হবে। কিন্তু সৎ শিক্ষিত ও সমাজমনস্ক একজন মহাপ্রাণ যত্নবান কবি, বৃটিশ সাহিত্য শিল্পে নিবিষ্ট ব্যক্তিদের যে জনবিচ্যুত আভিজাত্য, মেট্রোপলিটান দেশের উচ্চকোটির সংস্কৃতিসাধনায় আলোকিত অংশেই কেবলমাত্র যাদের পদচারণা তাঁদের সঙ্গী থেকে রক্ষণশীলতাতেই ঢাকা পড়েন তিনি। বৃটিশ সাম্রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান পেয়ে যান অর্ডার অব মেরিটও শেষ পর্যন্ত। অবশ্য কবিতায় নোবেল পুরস্কারও ॥

প উপরোক্ত রচনাটি লেখার সময় বিশেষভাবে এলিয়টেরই কিছু প্রবন্ধ ব্যবহার করা হয়েছে। প্রায় দশ বছর অন্তর অন্তর তাঁর চিন্তা নতুন রূপ পেয়েছে যেন—কিন্তু একটি স্থায়ী সুর তাতে রয়েই গেছে। যেমন Tradition and Individual Talent (1919), Dante (1929), The Humanisn of Irving Babbit (1928), The of Idea Christian Society (1939), Notes Towards the Definition of Culture (1948), What Is A Classic (1944)।

এলিয়টের পূর্বপুরুষ

চিন্ময় গুহ

সম্প্রতি একটি ইংরেজী দৈনিকে জীবনানন্দের 'বেড়াল' কবিতার ইংরেজী অনুবাদের শেষে বিদগ্ধ অনুবাদকের একটি তির্যক প্রশ্ন চোখে পড়ল : টি. এস. এলিয়ট না জন্মালে জীবনানন্দ কি এমন কবিতা লিখতে পারতেন ? স্বয়ং এলিয়টই যখন বলেছেন, "In poetry there is no such thing as originality, owing Nothing is the past," তখন এহেন অর্বাচীন প্রশ্নের কোনো অর্থ থাকে না। জীবনানন্দ অবশ্য এলিয়টের অনুমাত্রই গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু সামগ্রিকভাবে আধুনিক ইংরেজী ও ইংরেজী শাসিত কবিতায় এলিয়টের একক প্রভাব নিয়ে তর্ক নেই।

ধন্দ লাগে তখনই যখন দেখি এলিয়টের অজস্র স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও তাঁর জন্মদাতাদের চিনতে এলিয়ট-ভক্তদের তেমন উৎসাহ নেই। অর্থাৎ তাঁর কাব্য-ভাবনার একটি প্রধান সূত্রকে—কবিব্যক্তিত্বের গড়ে ওঠার পেছনে কবিতা-ঐতিহ্যের হাত—তাঁর নিজের কাব্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে তাঁরা নারাজ। কারণ, তাতে তাঁর কাব্যের চমক অনেক কমে যায়।

প্রুফ্রকের দ্বিধাদ্বন্দ্বের পশ্চাৎপটে শহরে কুয়াশার যে অভিনব বর্ণনা (The yellow fog that rubs its back upon the window panes,/The yellow smoke that rubs its muzzle on the window panes,/ Licked its tongue into the corners of the evening,/Lingered upon the pools that stand in drains……) তা তৎকালীন ইংরেজী কবিতার

পাঠককে যতই অভিভূত করুক, বাক্ রীতিতে বাক্ প্রতিমায় সুদূর প্রসারী ছায়া ফেলুক না কেন, ফরাসী কবিতার জগতে তা অন্তত পাঁচ যুগ পুরোনো (স্মর্তব্য, বোদলেয়রের Un brovillard sale et faune inondait tont l'espace : A dirty, yellow fog inundated the whole area—Les Sept Vieillards)। আত্মাহীন শহরের মালিন্যের সম্মোহক মুগ্ধতা ও বিষাদ ইংরেজী কাব্যে এলিয়টের আগে কল্পনাতীত ছিল, কিন্তু ফ্রান্সে নয়। ফরাসী কবিতার পাঠক এখানে বোদলেয়রীয় মানসিকতার ও শব্দবন্ধের হুবহু অনুলিখনে বিরক্ত হতে পারতেন। তাঁরা কৌতুক বোধ করতে পারতেন প্রতীকীবাদীদের—শুধু লাফর্গ নয়, র‍্যাঁবো, ভের্লেন ও করবিয়েরের—নির্লজ্জ উপস্থিতিতে। অনেক ফরাসী সমালোচক যখন লেখেন এলিয়টে কিছুই রহস্যাবৃত নয় (It n'y a la rien de mysterieux), তখন সত্যিই কবি-শিষ্যদের কান লাল হওয়ার কথা!

এলিয়ট যে কত অনায়াসে প্রভাবিত হতে ভালবাসতেন, সেটা Paris Review-এ একটি সাক্ষাৎকারে তিনি নিজেই বলেছেন। তিনি এবং পাউণ্ড নাকি তেওফিল গোতিয়ে-র কবিতা পড়ে ভাবতে লাগলেন গোতিয়েকে ব্যবহার করা যাবে কিনা (Have I anytling to say in which this form will be useful ?) প্রথম যৌবনে ঠিক এমনিভাবেই এডগার অ্যালেন পো, ওমর খৈয়াম এবং বায়রনের অনুকরণ করতে চেয়েছিলেন। পরে বোদলেয়র এবং আর্থার সাইমনসের ফরাসী প্রতীক-বাদী কবিতা-বিষয়ক বইটি তাঁর জীবনের গতিপথ বদলে দেয়।

প্রথাগত অনুভবকে অস্বীকার, আবেগ সম্পর্কে চাপা শ্লেষ, তীব্র আত্ম-সচেতনতা ও আত্মবিদ্রূপ, এক নতুন ঠাণ্ডা কথ্যরীতি, ভঙ্গুর বস্তুজগতকে মেনে নেওয়া—এলিয়টের প্রাথমিক অভিনবত্বের অনেকখানিই লাফর্গের কাছ থেকে নেওয়া। একাধিক ফরাসী নিবন্ধে তিনি অকপটে জানিয়েছেন কবিতা মানেই তখন তিনি বুঝতেন ফ্রান্সকে, লাফর্গকে।

তাঁর প্রথম কবিতার বই যাঁকে উৎসর্গ করেন সেই জঁ৷ ভেরছনালের সাথে প্যারিসে তাঁর আলাপ এই লাফর্গ প্রীতির সূত্রেই। এলিয়টের বিখ্যাত বিযুক্ত অনুভূতির তত্ত্বের পেছনেও লাফর্গের কবিতা কাজ করেছে বলে মনে হয়।

ফরাসী না জানা বাঙালী পাঠকের পক্ষে বোঝা শক্ত তাঁর অনেক ইংরেজী পংক্তিও কতখানি ফরাসী। Rhapsodey On a Windy Night-

-এ regard ('Regard that moon'), remark ('remark that woman') তো আসলে ফরাসী ক্রিয়াপদ।

এলিয়ট খুব খোলাখুলিভাবে ফরাসী কবিতার আবিষ্কারকে ইংরেজী কবিতায় এনে আশ্চর্যজনকভাবে সফল হয়েছিলেন। ইংরেজ সমালোচক যতই দাস্তে, এলিজাবেথীয় নাট্যকার ও মেটাফিজিকাল কবিকুলের প্রভাবের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে এলিয়টের মহাকবিত্বকে অক্ষুণ্ন রাখার (এর জন্য এলিয়টও কিছুটা দায়ী, তিনি এঁদের নিয়ে দীর্ঘ প্রবন্ধ ফেঁদেছেন কিন্তু তাঁর ফরাসী পিতৃকুলকে নিয়ে আলাদা করে কিছু লেখেননি) চেষ্টা করুন, ইংরেজী কাব্যের আংশিক লাতিনীকরণই বোধহয় তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান। বোদলেয়ার থেকে ভালেরি পর্যন্ত ফরাসী কাব্যের ঐতিহ্য বিনা এলিয়টের উপস্থিতি অচিন্ত্যনীয় ছিল; এই ঘরানার প্রভাব আত্মস্থ করে শেষ পর্বের এলিয়ট যখন আধ্যাত্মিক মহাকাব্যিকতায় উত্তরণ খোঁজেন তখনও তাঁর মন্ত্রোচ্চারণকে প্রভাবিত করেন ক্লোদেল বা স্যাঁ-জন পার্স।

এক সময় শুধু ফরাসীতেই লিখতে চেয়েছিলেন তিনি। সুবিধে হয়নি। ফরাসী পাঠককে টানার মত বিশেষ কিছু তাঁর ঝুলিতে ছিল না। কিন্তু ইংরেজী কবিতার ভাষায় স্থিতিস্থাপকতা অনেক গুণ বাড়িয়ে দেওয়ার পেছনে এলিয়টের বিরাট ভূমিকা কিছুতেই অস্বীকার করা যাবে না॥

সাগরপারের বাণী :
এলিয়ট ও বাংলা কবিতা

সুমিতা চক্রবর্তী

সাহিত্যের বাণীতে প্রকাশিত হয় একটি জাতির আবেগ ও মনন ; শিক্ষা ও পরিবেশ ; অভিজ্ঞতা, স্বপ্ন, কল্পনা ও ঐতিহ্যের যাবতীয় উত্তরাধিকার। আধুনিক কালের শিক্ষিত বাঙালির মনোজগতের অন্যতম দিক হলো পাশ্চাত্য চিন্তাভাবনার সঙ্গে সংশ্লেষ। উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই সুনিয়মিত ইংরেজি শিক্ষার সূত্রে ইউরোপের বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যের যে-সংস্পর্শ বাঙালির মননস্রোতে মিশে গেছে তা থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করা আজ আর সম্ভব নয়। ইতিহাসের অস্বীকারে প্রয়োজনই বা কি? মধুসূদনের কাব্য ও কবিতায় প্রধান হয়ে উঠেছিলো ইউরোপের ক্লাসিক্যাল কবিতার ছাঁচ। রবীন্দ্রনাথ ইউরোপের রোমান্টিক কবিতার স্রোতকে মিশিয়ে নিয়েছিলেন নিজের রচনায়। রবীন্দ্র-উত্তরকালে প্রধান হয়েছিলেন ইউরোপের উত্তর-রোমান্টিক নব্যধারার কবিরা। একেবারে আধুনিক কালে অবশ্য বাঙালি কবি সম্পূর্ণ স্বদেশীয় উত্তরাধিকার থেকেই আহরণ করে নিতে পারছেন সৃষ্টির প্রেরণা। আজকের বাঙালি কবির লেখায় পশ্চিমি কাব্য-প্রবাহের প্রত্যক্ষ ছায়া আর স্পষ্টভাবে পড়ে না। তবে প্রতীচ্যের ভাবনার শরিক হওয়ার হাত এড়ানো তৃতীয় বিশ্বের কোনো শিক্ষিত মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। সে-প্রসঙ্গ আলোচনার ক্ষেত্র আলাদা।

টি, এস, এলিয়ট ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে 'মেজর' কবি না 'মাইনর' অথবা 'মাইনর'-দের মধ্যে 'মেজর'— এ নিয়ে বিতর্ক আছে। তবু একথা স্বীকার করেন

সকলেই—প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইউরোপের ভাঙা চেহারার, নিরাশ্বাস ও যান্ত্রিক জীবনের যথার্থ ও বিশ্বস্ত রূপকার ছিলেন এলিয়ট। তাঁর প্রথম পর্বের কবিতায়—১৯২২-এ প্রকাশিত 'ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' পর্যন্ত—যেমন ভাবে মুখ দেখেছে সমকালের ইউরোপ, তেমন ভাবে দেখেনি আর কারো লেখায়। ১৯৩০-এ প্রকাশিত 'অ্যাশ্ ওয়েড্‌নস্‌ডে' থেকে এলিয়ট যে ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে যন্ত্রণাবোধের নিরসনে পৌঁছবার চেষ্টা করেছিলেন তা-ও ছিলো ইউরোপের সমকালীন মানসের সঙ্গে সামঞ্জস্যময়।

হয়তো এলিয়ট খুব মহৎ কবি ছিলেন না, হয়তো তাঁর অনুভবের তীব্রতা ও সৃষ্টির বিশালত্ব ছিলো অনেকের চেয়েই কম। তবু, এ বিষয়ে সংশয় নেই কোনো যে, খুব আশ্চর্য ধরনের এক সংযোগ স্থাপনের ক্ষমতা ছিলো তার। দুরূহ কবিতা লিখেও পাঠকের সঙ্গে একটা সহমর্মিতায় জড়িয়ে যাবার উদাহরণ বেশি দেখা যায় না। তাঁর সমকালেরই এজরা পাউণ্ড্ পারেন এরকম। এলিয়ট-এর কবিতার সেই সংযোগ ঘটেছিলো ইংরেজিভাষী দেশ সমূহ অতিক্রম করে সুদূর বাংলার কবি ও পাঠকদের সঙ্গেও অবিরল। যদিও, আগেই বলেছি, বাঙালি মানস পাশ্চাত্য কবিতার রস গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থেকেছে সব সময়েই।

এলিয়ট-এর প্রথম কবিতা-সঙ্কলন 'প্রুফ্রক্ অ্যাণ্ড্ আদার অবজারভেশন্‌স্' প্রকাশিত হয় ১৯১৭-তে। বাংলা কবিতার আসরে তখন প্রতিষ্ঠিত মহিমান্বিত রবীন্দ্রনাথ। নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন চার বছর আগে, সবে প্রকাশিত হয়েছে 'বলাকা'র সমুজ্জ্বল কবিতাবলী।

রবীন্দ্রনাথ এলিয়ট্‌কে প্রথম দেখেছিলেন ১৯১৩-তে হার্ভাড্-এ এক অধ্যাপক-গৃহের আপ্যায়ন অনুষ্ঠানে। আর্. এফ্. র‍্যাট্রে (Rattray) একটি পুস্তিকায় বলেছেন—"While Tagore was at Harvard a 1913, Professor and Mrs Wood invited a number of guests to their house to meet him : one was T. S. Eliot, who was a fellow student of mine."[১]

তরুণ বিশ্ববিদ্যালয়-ছাত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের তেমন আগ্রহ জাগার কথা নয়। পরবর্তী কালেও রবীন্দ্রনাথ আধুনিক ইউরোপীয় কবিদের সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহ বোধ করেননি—বহুবার বিশ্বভ্রমণ করা সত্ত্বেও। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইউরোপীয় ও বাংলা—উভয় সাহিত্য সম্পর্কেই তাঁর মনের একটি আড়ষ্টতা, একটি দূরত্ববোধ অনুত্তীর্ণ থেকে গিয়েছিলো চিরকাল।

আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি একাধিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন কিন্তু সে-বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্তগুলি আজ আর আমাদের সম্পূর্ণ সমর্থন পায়না। আধুনিক সাহিত্য বিষয়ে নিজের মতামত প্রকাশের সূত্রেই এলিয়ট্-এর নাম প্রথম করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধটি সুপরিচিত, প্রকাশিত হয়েছিলো পরিচয়', বৈশাখ ১৩৩৯-এ। রচনাটিতে দেখা যায়, এলিয়ট্-এর প্রথম পর্বের কবিতা রবীন্দ্রনাথের ভালো লাগছেনা। আধুনিক কবিরা যে শুধু পোকায় খাওয়া ফুলই বেছে নেন—একথা বোঝাতে গিয়ে তিনি এলিয়ট্-এর 'প্রেলিউড্স্' ও আণ্ট্ হেলেন্' কবিতা দুটির কিছুটা করে অংশ অনুবাদ করে দিয়েছেন। এই প্রবন্ধটি রচিত হয়েছিলো 'দ্য নিউ পোয়েট্রি' নামে একটি সঙ্কলন-গ্রন্থের সমালোচনা হিসেবে (হ্যারিয়েট মন্‌রো ও ফিলিপ্ জেণ্ডার সন্ সম্পাদিত)। কাজেই সেই সঙ্কলনে এলিয়ট্-এর যে কবিতাগুলি গৃহীত হয়েছিলো কেবল সেগুলির সাহায্যেই গড়ে উঠেছিলো রবীন্দ্রনাথের এলিয়ট্ সম্পর্কে ধারণা। এলিয়ট্-এর পরবর্তী কবিতাবলী—বিখ্যাত, 'ওয়েস্টল্যাণ্ড' বা সদ্যোপ্রকাশিত 'অ্যাশ্ ওয়েড্‌নস্‌ডে' তখনও রবীন্দ্রনাথ পড়েননি ভাবতে একটু অবাক লাগে কারণ 'পরিচয়' পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই সুধীন্দ্রনাথ দত্ত 'কাব্যের মুক্তি' (শ্রাবণ ১৩৩৮) প্রবন্ধে উদ্ধৃত করেছিলেন 'ওয়েস্ট্ ল্যাণ্ড্' থেকে চমৎকার একটি অংশ।

'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধটির সূত্রেই এলিয়ট্-এর সঙ্গে আর একটি সংযোগ স্থাপিত হলো রবীন্দ্রনাথের—তাঁর অজ্ঞাতসারেই। সে-কাহিনীও বহু পরিচিত। সংক্ষেপে তা এই রকম—এলিয়ট্-অনুরাগীদের অন্যতম বিষ্ণু দে সেই সময়ে পড়ছিলেন ১৯৩০ নাগাদ প্রকাশিত এলিয়ট্-এর 'এরিএল্' নামক কবিতা-গ্রন্থ। সেই সময়েই তিনি আরো ভাবছিলেন গদ্যছন্দ নিয়ে। 'এরিএল্' গ্রন্থের আট সংখ্যক কবিতা 'জার্নি অভ্ দ্য মেজাই' তিনি অনুবাদ করেছিলেন নিজের মতো গদ্যছন্দে। সেই বিশেষ সময়টি রবীন্দ্রনাথেরও গদ্যছন্দ চর্চার কাল। 'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধটি পড়ে কিন্তু ক্ষুব্ধ হলেন বিষ্ণু দে এবং কবির নাম গোপন করে স্বকৃত অনুবাদটি রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে দিলেন গদ্যছন্দে লিখে দেবার অনুরোধ জানিয়ে। রবীন্দ্রনাথ গদ্যছন্দে কবিতাটি আবার লিখে দিলেন। কিন্তু এখানে প্রশ্ন থাকে একটি। বিষ্ণু দে অনুবাদটির সঙ্গে মূল ইংরেজি কবিতাটিও পাঠিয়েছিলেন কি? ঐ সূত্রে রবীন্দ্রনাথকে যে-চিঠি তিনি লিখেছিলেন তাতে

ছিলো—"তাই আপনাকে সাহস করে একটি কবিতার অনুবাদ পাঠাচ্ছি। এরপরে একটি আরো স্পষ্ট ছন্দগন্ধী অনুবাদ করেছিলুম। কিন্তু সেও এর মতো অদ্ভুত ও দুর্বল ছিল ও আপাতত সেটা হারিয়ে গেছে।" —এই চিঠির পাদটীকায় বিষ্ণু দে জানিয়েছেন যে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যখন রবীন্দ্রনাথকে জানান—বিষ্ণু দে প্রেরিত অনুবাদটি এলিয়ট্-এর কবিতার, তখন রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—"এলিঅট তো তবে ভালো লেখে, তার প্রতি আমি তো অন্যায় করেছি, তুমি ঐ কবিতাটির অনুবাদ ওর কাছ থেকে নিয়ে ছেপো।" ঐ পাদটীকাতেই বিষ্ণু দে আরো লিখেছেন—"তার পরে তিনি (রবীন্দ্রনাথ) ইংরেজি কবিতাটি ও তার অনুবাদটি মিলিয়ে দেখেন, এবং সংশোধন করেন। এবং সেইটেই হল ১৩৩৯-এর এলিয়ট অনুবাদ।" এর থেকে মনে হয় বিষ্ণু দে-র করা প্রথম অনুবাদটির পর প্রথম যে কবিতাটি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ সেটি মূল ইংরেজি পাঠ না দেখেই করা হয়েছিলো। বিষ্ণু দে আরো জানিয়েছেন যে, তাঁর পাঠানো সেই প্রথম অনুবাদটি, আরো একটি ছন্দগন্ধী অনুবাদ, রবীন্দ্রনাথের সংশোধিত কপি এবং রবীন্দ্রনাথের করা প্রথম অনুবাদটি—সবগুলিই হারিয়ে গেছে। আছে কেবল রবীন্দ্রনাথের সংশোধিত রচনাটি—যেটি মূল কবিতার সঙ্গে মেলানো। রবীন্দ্রনাথের 'তীর্থযাত্রী' নামের অনুবাদটি সকলেই পড়েছেন (প্রথম প্রকাশ পরিচয়', মাঘ, ১৩৩৯)। 'জার্নি অভ্ দ্য মেজাই' কবিতার 'রাজর্ষিদের যাত্রা' নামে বিষ্ণু দে-র করা যে-অনুবাদটি আমরা এখন পড়ি সেটি করা হয়েছিলো আরো অনেক পরে—পরিণত বয়সে একথাও জানিয়েছেন তিনি নিজেই।

রবীন্দ্রনাথ-কৃত এলিয়ট্-এর প্রথম পর্বের কবিতার অনুবাদের কিছুটা আমরা এখানে দেখতে পারি। খণ্ডাংশের অনুবাদ হলেও তা মূল্যবান কারণ অনতি প্রচুর বাংলা এলিয়ট্-অনুবাদ-সংগ্রহে তা রবীন্দ্রনাথের সংযোজন।

The winter evening settles down
With smells of steaks in passageways,
Six O' clock.
The burnt out ends of smoky days,
And now a gusty shower wraps
The grimy scraps

Of withered leaves about your feet
And newspapers from vacant lots,
The showers beat
On broken blinds and chimney-pots,
And at the corner of the street
A lonely cab-horse steams and stamps.

(Preludes)

এঘরে ওঘরে যাবার রাস্তায় সিদ্ধ মাংসের গন্ধ
তাই নিয়ে শীতের সন্ধ্যা জমে এল।
এখন ছ'টা
ধোঁয়াটে দিন পোড়া বাতি, শেষ অংশে ঠেকল।
বাদলের হাওয়া পায়ের কাছে উড়িয়ে আনে
পোড়ো জমি থেকে ঝুলমাখা শুক্‌নো পাতা
আর ছেঁড়া খবরের কাগজ।
ভাঙা শার্সি আর চিম্‌নির চোঙের উপর
বৃষ্টির ঝাপট লাগে,
আর রাস্তার কোণে একা দাঁড়িয়ে এক ভাড়াটে গাড়ির ঘোড়া,
ভাপ উঠচে তার গা দিয়ে আর সে মাটিতে ঠুকচে খুর।

('আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধে ধৃত)

এই কবিতাটির শেষ তিন পঙক্তিরও অনুবাদ করেছেন রবীন্দ্রনাথ, আর করেছেন 'আণ্ট হেলেন্' কবিতার কয়েক ছত্র। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবশ্যই 'তীর্থযাত্রী'।

১৯৩২-এ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এলিয়ট্-এর সংযোগ এই পর্যন্তই। 'জার্নি অভ্ দ্য মেজাই' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের ভালো লেগেছিলো। লাগারই কথা। মানুষের প্রাণযাত্রার শক্তি ও ধর্মীয় বিশ্বাসের মহিমা কবিতাটিতে ব্যক্ত। খ্রিস্টেরও অনুরাগী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু সেই সময়ে এলিয়ট্-এর সমগ্র রচনা সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ জেগেছিলো বলে মনে হয় না। কিছুকাল পরে গদ্যকবিতা বিষয়ে একটি চিঠিতে তিনি বুদ্ধদেব বসুকে লিখেছিলেন— "গদ্যকাব্য সম্পর্কে তর্ক না করে যথেচ্ছ লিখে যাওয়াই ভালো। আজ যারা আপত্তি করছে কাল তারা নকল করবে। এলিয়ট প্রমুখ অনেক কবি নির্মিল নিশ্ছন্দ কবিতা লিখে চলেছেন সেটাকে যাঁরা

সাদরে স্বীকার করেন তাঁদের মনোভাব × × × দের (?) মতো—তারা যে শ্রেণীর লেখায় চোখ রাঙায় ইংরেজের সেই শ্রেণীর লেখার কাছে হাত জোড় করে থাকে।" (৬।১১।১৯৩৬-এ লেখা চিঠি; দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮১)

এই চিঠিতে এলিয়ট্ সম্পর্কে বিশেষ কোনো প্রীতি বা বিরূপতার সুর নেই—প্রাসঙ্গিক উল্লেখ মাত্র। তবে 'নির্মিল নিশ্ছন্দ' শব্দদুটির সঙ্গে হয়তো একটু অকারণ অপ্রীতি জড়ানো। ঐ জাতীয় 'নির্মিল নিচ্ছন্দ' কবিতা ১৯৩৬-এর আগেই অনেক লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ। এলিয়ট্-এর কবিতা ঠিক ততটা মিল ও ছন্দহীন নয়ও।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পাশ্চাত্য সাহিত্য রবীন্দ্রনাথ পড়েছিলেন তবে ধারাবাহিক বা পদ্ধতিবদ্ধ ভাবে নয়। যখন যা হাতে পেতেন তাই পড়তেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে মন্তব্য প্রকাশ করতেন চিঠিতে বা মৌখিক আলাপে। এভাবেই এরপর তিনি এলিয়ট্-এর লেখা পড়েছিলেন যখন অমিয় চক্রবর্তী প্রবাস থেকে ইউরোপীয় কবিদের রচনা পাঠিয়ে দিতেন তাঁকে। ২৩।২।৩৯-এ একটি চিঠিতে অমিয় চক্রবর্তীকে তিনি লিখেছেন—"আমার বড়ো বড়ো বহরের চিঠি দেখে মনে কোরো না আমার অবকাশের waste land বুঝি বহুবিস্তৃত।" (চিঠিপত্র, একাদশ খণ্ড)। এই বাগ্-ব্যবহারে 'ওয়েস্ট্ ল্যাণ্ড' পড়ার পরিচয় পাই যদিও শব্দদুটির সঙ্গে এলিয়ট্ যে মিশিয়েছিলেন প্রগাঢ় বেদনাময় বোধের নির্যাস—রবীন্দ্রনাথ সেরকম কিছু করেননি। সাধারণ ভাবে তুচ্ছার্থে-ই শব্দ দুটি ব্যবহৃত। অবশ্য পড়েছিলেন যে, তা-ও জোর করে বলা যায় না। হয়তো নামটিই শুনেছিলেন কেবল। পড়া থাকলে 'ওয়েস্ট ল্যাণ্ড'-এর উপনিষদ্-বাণী ব্যবহার সম্পর্কে কোনো মন্তব্য কি কখনো করতেন না রবীন্দ্রনাথ? এলিয়ট্ সম্পর্কে পৃথক কোনো আলোচনা কোথাও নেই চিঠিগুলিতে। ১৯৩৯-এরই আর একটি চিঠিতে শুধু জানিয়েছেন যে, 'ফ্যামিলি রি-ইউ-নিয়ন' তাঁর 'গভীরভাবে ভালো' লেগেছে।

প্রতীচ্যের আধুনিক কাব্য বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যগুলির সাহায্যে দুটি মূল বক্তব্যের সন্ধান পাওয়া যায়। কখনো তিনি বলেছেন অসুন্দর ও তুচ্ছতার এই সব জীবনচিত্র তাঁর ভালো লাগে না। কখনো বলেছেন, কিছু কিছু তাঁর ভালো লাগে কারণ তা অত্যন্ত বেশি আধুনিক নয়। তাদের সঙ্গে তুলনায় নিজে অত্যন্ত বেশি পিছিয়ে পড়েননি দেখে তিনি স্বস্তি পাচ্ছেন।

বস্তুত, সমগ্র আধুনিক কবিতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির মূলে—বাংলা কবিতা থেকে নিজের আসন টলে যাচ্ছে—এমন একটা ভয় ক্রিয়াশীল ছিলো মনে হয়। হয়তো এই ভয় থেকেই উঠে এসেছিলো আধুনিক কবিতা বিষয়ে তাঁর মতামতের অস্থিরতা। এ-ভয় যে একান্তই অর্থহীন তা আজ আমরা যেভাবে অনুভব করি, তাঁর নিজের পক্ষে শেষ বয়সে তা অনুভব করা সম্ভব ছিলো না হয়তো। এবং, এই ভয় থেকেই, কালোচিত হয়ে ওঠার ইচ্ছে থেকেই দেখা যায়, চিঠিতে ও কথায় আধুনিক সাহিত্যের কাদা ঘাঁটাঘাঁটি সম্বন্ধে বিরূপতা প্রকাশ করেও নিজের লেখার ভাষা-ভঙ্গি ও পর্যবেক্ষণ-কোণ কিছু কিছু বদলে নেবার চেষ্টা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তবে এলিয়ট্ প্রমুখ কবির লেখায় পারিপার্শ্বিকের সেই শ্বাসরোধী ছবিগুলি জীবনের গভীরতর উপলব্ধির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়; রবীন্দ্রনাথের লেখায় সেগুলি থেকে যায় বিচ্ছিন্ন ও তুচ্ছার্থক। জীবন-যাপনের সমগ্রতা প্রতিফলিত হয় না সেখানে। এই বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ ও বিস্তৃত আলোচনা করেছেন শঙ্খ ঘোষ তাঁর 'নির্মাণ আর সৃষ্টি' (বিশ্বভারতী, ১৩৮৯) গ্রন্থে। তিনি দেখিয়েছেন, এলিয়ট্-এর কোনো কোনো পঙক্তির অনুরূপ ছবিও চলে আসছে রবীন্দ্রনাথের কলমে।

সব মিলিয়ে এলিয়ট্ এবং আরো কোনো কোনো কবি সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারেননি রবীন্দ্রনাথ। ক্রমে পশ্চিমের কবিদের এই আধুনিকতা-বোধের গভীরতার দিকটাও সম্ভবত তিনি কিছুটা বুঝেছিলেন। অন্তত একটি চিঠিতে আমরা সেরকম সাক্ষ্য পাই। কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-কে লেখা চিঠিতে (১৯৪০, তারিখ নেই) তিনি বলেছেন—"এলিয়ট, অডেন প্রভৃতি আধুনিক ইংরেজ কবির মনে বর্তমান কালের দুর্যোগের যে আঘাত লেগেছে সেটা সত্য এবং প্রচণ্ড সেই সংঘাতে চিন্তার তরঙ্গ উঠে আগেকার কালের অভ্যস্ত ভাষাধারার কাঠামো ভেঙে ফেলেছে। ভঙ্গী বদল হয়েছে কিন্তু তাঁদের রচনায় এ যুগের বাণী উঠছে জেগে কতক স্পষ্ট রূপ নিয়ে কতক অস্পষ্ট ব্যঞ্জনায়। তাঁরা যথার্থ কবি এই জন্যে বাণী তাঁদের মনে আলোড়িত হয়ে উঠলে সেটা ব্যক্ত না করে থাকতে পারেন না বলেই লেখেন।" (দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮২) যে-আধুনিকতার ধরণটি প্রতিষ্ঠা করতে চাইছিলেন এলিয়ট্, অডেন্ প্রমুখ কবিরা—তার সম্পর্কে একমাত্র এই চিঠির ভাষাতেই সম্ভবত প্রকাশ পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের সহমর্মী অনুভব।

এরও পরে ১৯৪১-এ আর্. এফ্. র‍্যাট্রে-কে এলিয়ট্ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ

লিখেছিলেন—"I am interested to read what you say about Mr. T. S. Eliot—some of his poetry have moved me by their evocative power and consummate craftsmanship" (প্রতিক্ষণ, সংস্কৃতি সংখ্যা, ১৩৯৫)—এই মন্তব্যটি অবশ্য খুব গভীর নয় কিন্তু কামাক্ষীপ্রসাদকে লেখা চিঠির অংশটি গুরুত্বপূর্ণ। শেষ বয়সেও এই ভাবে যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর পরিবর্তিত ভাবনার শরিক হয়ে ওঠা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে কিছুটা সম্ভব হয়েছিলো বলেই বিষ্ণু দে তাঁকে অভিহিত করতে পেরেছিলেন—"এলিঅটের, পিকাসোর প্রায় সহযাত্রী সমধর্মী অগ্রজ" বলে।

এলিয়ট্ শুধু কবিই ছিলেন না, ছিলেন প্রাবন্ধিক। তাঁর প্রবন্ধাবলীও বাঙালি কবিদের যথেষ্ট আলোড়িত করেছিলো। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ থেকে মনে হয় না যে, এলিয়ট্-এর মতামতের তেমন কোনো প্রভাব ছিলো তাঁর চিন্তায়। আধুনিক সাহিত্য বিষয়ে তাঁর মতামত নিজের পাঠ-পরিধির সূত্রে তিনি গড়ে তুলে ছিলেন নিজেই।

বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে এলিয়ট্-এর সম্পর্ক স্থাপনে উল্লেখযোগ্য একটি ভূমিকা ছিলো সুধীন্দ্রনাথ দত্তের। এক্ষেত্রেও সেই ভূমিকার নেপথ্যে গতি সঞ্চার করেছিলেন বিষ্ণু দে। অত্যন্ত অল্পবয়সেই এলিয়ট্-এর 'পোয়েম্স্' (১৯২০) ও 'দ্য সেক্রেড্ উড্' (১৯২০) পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন বিষ্ণু দে, অনুভব করেছিলেন কারো সঙ্গে আলোচনা করবার আগ্রহ। সেই তাগিদেই তিনি মিলিত হলেন সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে কারণ তিনি জানতে পেরেছিলেন—"হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মশায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুধীন্দ্রনাথ এই কবির ও সমালোচকের মুগ্ধ পাঠক।"৩ তারই ফলে—"এলিয়ট পাঠের নন্দিত উত্তেজনা থেকে হল সামাজিক সম্বন্ধোত্তর সাহিত্যিক সৌহার্দ্য।"৪ বিষ্ণু দে-র আগ্রহেই সুধীন্দ্রনাথের এলিয়ট্-প্রীতি সক্রিয় সাহিত্যিক উদ্যমে পরিণত হয়। তাঁরই অনুরোধে প্রস্তুত হয় এলিয়ট্-এর কাব্যভাবনার ব্যাখ্যা-সূত্রে রচিত 'কাব্যের মুক্তি' প্রবন্ধটির প্রথম খসড়া। এ সম্পর্কে বিষ্ণু দে-র কাছে লেখা সুধীন্দ্রনাথের পত্রাংশ উল্লেখযোগ্য—"আপনারা আমার কাছে Eliot-সম্বন্ধে একটা সারগর্ভ প্রবন্ধের প্রত্যাশা করেন, এটা নিশ্চয়ই গৌরবের বিষয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমার অক্ষমতা আমার নিজের কাছে এতই স্পষ্ট যে আপনার অনুরোধে গর্বের চেয়ে ভয়ই বেশী অনুভব করছি।" (২৫ বৈশাখ, ১৩৩৫)৫

তবু লেখা হলো সেই প্রবন্ধ। প্রধানত বিষ্ণু দে-রই উদ্যোগে ইউ-

নিভার্সিটি ইনস্‌টিটিউট-এ ছোটো একটি ঘরোয়া সভায় অতুলচন্দ্র গুপ্তের সভাপতিত্বে অল্প কয়েকজন শ্রোতার সামনে পড়াও হলো লেখাটি ১৯২৮-এর মাঝামাঝি।

কিছুকাল পরে প্রকাশিত হলো 'পরিচয়'—প্রবন্ধ-নির্ভর, মননমূলক, অভিজাতের পত্রিকা। টি. এস. এলিয়ট্ সম্পাদিত 'ক্রাইটেরিয়ন্' (১৯২২) পত্রিকাই ছিলো 'পরিচয়'-এর আদর্শ—একথা বলেছেন অনেকেই। ১৯৩১-এ 'পরিচয়' প্রকাশিত হবার ঠিক আগে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী হয়ে বিদেশযাত্রা করেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ ১৯২৯-এ। রবীন্দ্রসঙ্গ ছেড়ে কিছুদিন তিনি ছিলেন আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড ও জার্মানিতে। তখনই এলিয়ট্-এর পত্রিকাটি তিনি দেখেছিলেন।

বাংলা পত্রিকার ইতিহাসের একটি দিকচিহ্ন 'পরিচয়'। প্রবন্ধকে প্রাধান্য এবং গ্রন্থ সমালোচনাকে বিশেষ গুরুত্ব দেবার আগ্রহ এই পত্রিকা থেকেই বাংলা সাহিত্য-পত্রিকার একটি ধারা সৃষ্টি করে। কবিতা ও কাব্যপ্রকরণ সম্পর্কে এলিয়ট্-এর চিন্তার সঙ্গে বাঙালি পাঠকের পরিচয় করিয়ে দিলেন সুধীন্দ্রনাথ। সে কাজের মঞ্চ হলো এই পত্রিকা।

'পরিচয়'-এর প্রথম সংখ্যাতেই (শ্রাবণ, ১৩৩৮) ১৯২৮-এ পঠিত সেই প্রবন্ধটি মুদ্রিত হলো যথোচিত পরিমার্জনাসহ। কবি ও কবিতা সম্পর্কে এলিয়ট্-এর উক্তিগুলি লেখক বিবৃত করলেন এই প্রবন্ধে। বিংশ শতাব্দের বিশুষ্ক পৃথিবীর প্রকৃত রূপকার বলে স্বীকার করলেন এলিয়ট্-কে। 'ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' থেকে দীর্ঘ অংশ উদ্ধার করে একালের কবিতার উদাহরণ পেশ করলেন এবং এলিয়ট্-এর মতামতকে অনেকটা স্বীকারও করলেন। সুধীন্দ্রনাথ বললেন—"কবি ঘটকের মতো, পাত্র এবং পাত্রীর মিলন ঘটলেই তার প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়,......এই রকমের কোনো একটা আদর্শ সামনে রেখেই Eliot কবিকে Catalytic agent উপাধি দিয়েছেন।" এলিয়ট্-এর উক্তিটি বহু পরিচিত—"The analogy was that of the catalyst. When the two gases previously mentioned are mixed in the presence of a filament of platinum, they form sulphurous acid." (Tradition and Individual Talent, The Sacred wood)। এলিয়ট্ বলেছেন প্ল্যাটিনাম থাকলে তবেই এই মিলন সম্ভব কিন্তু মিশ্রণটিতে কোন প্ল্যাটিনাম থাকে না এবং প্ল্যাটিনাম নিজে থাকে সর্বদাই অপরিবর্তিত। কবিচিত্তকে সেই প্ল্যাটিনামের সঙ্গেই তুলনা করেছেন এলিয়ট্ যার দ্বারা

ঘটে বিভিন্ন অনুভব ও অভিজ্ঞতার মিশ্রণ কিন্তু কবির চেতনায় পরিবর্তন ঘটে না, কবির সৃজনী ক্ষমতা কিছুটা অবিচলিত দূরত্বে অবস্থান করতে সক্ষম হয়।

বিভিন্ন প্রাচীন কবির রচনাংশ ব্যবহারে যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন এলিয়ট্ তার সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন সুধীন্দ্রনাথ। ১৯২০-তে প্রকাশিত 'দ্য সেক্রেড্ উড্' প্রবন্ধ-সংকলনটির সঙ্গে পরিচয় ছিলো কোনো কোনো বাঙালি সাহিত্য-পাঠকের। কিন্তু আধুনিক সাহিত্য-রুচির বিশিষ্ট পত্রিকা 'পরিচয়'-এর প্রথম সংখ্যার প্রধান প্রবন্ধ হিসেবে এলিয়ট্-এর ভাবনাকে এতখানি গুরুত্ব দেওয়ায় সাহিত্যমনস্ক সকলেরই দৃষ্টি গিয়ে পড়লো এলিয়ট্-এর উপর।

কিছুদিন পরেই রবীন্দ্রনাথের 'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধটিতে আবার ফিরে এলেন এলিয়ট্। তাঁকে কিছুটা নিন্দাই করলেন রবীন্দ্রনাথ। ফলে এলিয়ট্-ভক্ত অনেকেই ক্ষুব্ধ হলেন মনে মনে। তাঁদের মতামতের সুসংহত প্রবন্ধ-রূপ আমরা পেলাম সুধীন্দ্রনাথের 'ঐতিহ্য ও T. S. Eliot' প্রবন্ধটিতে। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের লেখার প্রতিক্রিয়া হিসেবেই প্রবন্ধটি রচিত ও প্রকাশিত হয় 'পরিচয়', শ্রাবণ, ১৩৪১-এ। প্রবন্ধটির নাম থেকেই বোঝা যায় এলিয়ট্-এর 'ট্র্যাডিশন্ অ্যাণ্ড্ ইন্‌ডিভিজুয়াল্ ট্যালেণ্ট্' প্রবন্ধটিই ছিলো সুধীন্দ্রনাথের অবলম্বন।

এলিয়ট্-এর প্রবন্ধে কবিতা ও কবি সম্পর্কে যে-সব কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে দুটি কথাকে প্রাধান্য দিলেন সুধীন্দ্রনাথ। এক, বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও অনুভবের মিশ্রণের সাহায্যে কবিচিত্ত সচেতন ভাবে এবং আবেগতাড়িত না হয়ে কবিতায় উপস্থিত করবে 'সুসঙ্গত অবৈকল্য নির্মাণ'। দুই, কবিতাকে সংযোগ রাখতে হবে কাব্য-ঐতিহ্য, জাতিগত চৈতন্য ও স্বদেশী সাহিত্যের মূল সূত্রগুলির সঙ্গে। এই দুটি অভিমতই কম বেশি ভাবিয়েছিলো সুধীন্দ্রনাথসহ সমকালের প্রায় সব কবিকেই। কাব্যসৃজনী নৈর্ব্যক্তিকতার আদর্শটি বিশেষভাবে গ্রহণ করেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে। স্বদেশী মূল-সংলগ্নতার বিচিত্র পরিচয়ও পাওয়া যায় তাঁদের দুজনের ও জীবনানন্দের কবিতায়। জীবনানন্দের ক্ষেত্রে অবশ্য ভিন্নতর উৎসও ছিলো।

সুধীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধটিতে কিন্তু এলিয়ট্-এর প্রতি কোনো মুগ্ধ মনো-ভাব লক্ষ করা যায় না।—"উক্ত সকল রচনারীতি আপাতদৃষ্টিতে প্রাঞ্জলতার পরিপন্থী হলেও, সহজতাই তাঁর উদ্দেশ্য; এবং সেইজন্যেই এলিয়ট্ প্রত্যাশা করেন যে বুদ্ধি দিয়ে বোঝার বহু পূর্বেই তাঁর কবিতা পাঠকের

চিত্তে অর্থের বীজ ছড়াবে।"—এই দাবি মানতে পারেন নি সুধীন্দ্রনাথ। তিনি কবির বক্তব্যের সঙ্গে পাঠকের সচেতন মনের যৌক্তিক সংযোগ প্রথম থেকেই প্রত্যাশা করেছেন। মনস্তত্ত্ববিদের উক্তির উদ্ধারে তিনি বলেছেন—"অভ্যাঘাত যদি সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত হয়, তবে তার দ্বারা মনের উদ্বোধন প্রায় অসম্ভব।"

এর পরেই এলিয়ট্ সম্পর্কে একটি সংহত মূল্যায়ন করে তিনি প্রবন্ধটি শেষ করেছেন—"এলিয়ট বোধহয় ওই ধরনের কবি নন, অন্ততপক্ষে তাঁর কাব্য এখনো তর্কাতীত উৎকর্ষে উঠতে পারে নি।……তাঁর কাব্যাদর্শে ছিদ্র অনেক, কিন্তু সে আদর্শের প্রধান গুণ হলো এই যে তাকে বা তার থেকে উৎপন্ন কবিতাকে বুঝতে গেলে কাব্যের প্রকৃতি ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সমস্ত সমস্যার পুনরুত্থাপন অনিবার্য হয়ে পড়ে।" সুধীন্দ্রনাথের মতে 'হঠোক্তি' সত্ত্বেও জিজ্ঞাসা জাগান বলেই এলিয়ট্ বর্তমান ইংরেজি সাহিত্যে পরিব্যাপ্ত।

এলিয়ট্-এর যে-ভাবনাটি সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য মনে করেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ এবং সম্ভবত অন্যান্য আধুনিক কবিরাও—তা হলো. অনুভূত আবেগের কবিতা-রূপ দেবার সময়ে উচ্ছ্বাসকে নিয়ন্ত্রণে রেখে সৃজনী-প্রক্রিয়াকে সেই আবেগ-স্পর্শ থেকে যথাসম্ভব বিচ্ছিন্ন রাখা। এলিয়ট্-এর কিছু কিছু উক্তি, তাঁদের মনে হয়েছিলো, কবিতা-সৃজন বিষয়ে অতীব মূল্যবান।

১। 'The more perfect the artist, the more completely separate in him will be the man who suffers and the mind which creates ;...'

(Tradition and Individual Talent)

২। 'The progress of an artist is a continual self sacrifice, a continual extinction of personality.' (ibid)

৩। 'Poetry is not a turning loose of emotion, but the escape from emotion ; it is not the expression of personality, but an escape from personality.' (ibid)

কবি-মানসের সৃজনী প্রক্রিয়াকে কিছুটা নিরাসক্ত রাখার কথা বলা হয়েছে এইসব অংশে। এই অভিমত বিশেষভাবে স্পর্শ করেছিলো আধুনিক বাঙালি কবিদের।

সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় অবশ্য নৈর্ব্যক্তিকতার এই শাসন সব সময়ে বজায় থাকেনি। কিছুটা অন্তরায় হয়েছে তাঁর রবীন্দ্রানুরক্তি ও ছন্দ-মিলের প্রতি আনুগত্য। তবু, অনেক কবিতায় তিনি নিজেকে দেখেছিলেন আধুনিক সভ্যতার চাপে ক্লান্ত, বিষয়ী, প্রৌঢ় নাগরিকের ভূমিকায়। এলিয়ট্-এর কবিতায় এই দৃষ্টি-ভঙ্গির বিস্তার দেখা যায়। 'লাভ্ সঙ্ অভ্ জে আল্‌ফ্রেড্ প্রুফ্রক্', 'গেরোন্‌শন্,' 'ওয়েস্ট্ ল্যাণ্ড্' স্মরণীয়। এজাতীয় কবিতাগুলিতে বেদনাগর্ভ বিদ্রুপের ভঙ্গি এবং বাগ্‌রীতির কথ্য চালও অনেক সময়ে স্মরণ করাতে পারে এলিয়ট্-কে। অন্যের লেখাতেও যখনই এই নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গিটি দেখা গেছে তখনই তার প্রশংসা করেছেন সুধীন্দ্রনাথ।

অর্জিত জ্ঞান, উৎসারিত অনুভব ও আহরিত অভিজ্ঞতা কবিচিত্তে জমে উঠলে তবেই কবিতা সম্ভব হয়, বলেছিলেন এলিয়ট্—সুধীন্দ্রনাথও মনে করেন অভিজ্ঞতারই অন্য নাম প্রেরণা। এলিয়ট্-এর ঐতিহ্যপ্রীতিও সঞ্চারিত হয়েছিলো তাঁর মধ্যে। তিনিও নিয়েছিলেন কালিদাস ও সংস্কৃত সাহিত্য, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ থেকে; গ্রহণ করেছিলেন বিদেশী প্রসঙ্গের সহায়তা।

এলিয়ট্-এর আরো একটি প্রবন্ধ—'দ্য সেক্রেড্ উড্'-এর অন্তর্গত 'হ্যাম্‌লেট্ অ্যাণ্ড হিজ প্রবলেম্‌স্'—আধুনিক কবিদের আকৃষ্ট করেছিলো। এতেই আছে তাঁর বিখ্যাত 'অবজেকটিভ্ কোরিলেটিভ্' তত্ত্ব বা আবেগের সমান্তরাল বস্তুগ্রাহ্য রূপ-রচনার আবশ্যিকতার ধারণা। সামগ্রিকভাবে বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রোত্তর পর্বে যে একটি সংহতিঘন সাবয়বতা এসেছিলো তার কিছুটা অবশ্যই প্ররোচিত করেছিলেন ইমেজিস্ট কবিরা ও এলিয়ট্। সুধীন্দ্রনাথের কবিতাতেও আছে এই গুণটির অসামান্য নিদর্শন।

কেউ কেউ মনে করেন, নানা ছন্দের স্তবকবদ্ধ দীর্ঘ কবিতা রচনার রীতি এলিয়ট্-এর 'ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' থেকেই পেয়েছিলেন বাঙালি কবিরা। কারো কারো মনে হয়েছে সুধীন্দ্রনাথের 'অর্কেস্ট্রা' কবিতাটির গড়ন এলিয়ট্-অনুসারী। যদিও বিষয়বস্তুর এতটাই ভিন্নতা যে তাতে সংশয় পোষণেরও যুক্তি আছে। তবে এলিয়ট্-এর ব্যবহৃত ইমেজ যে সুধীন্দ্রনাথ কিছুটা নিয়েছিলেন তাতে বোধহয় সংশয় নেই। মরুভূমি বা বন্ধ্যা ভূমি, ফণি-মনসায় আকীর্ণ প্রান্তরের চিত্রকল্প ততটা যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের মরুভূমি থেকে আসেনি যতটা এসেছে এলিয়ট্-এর 'ওয়েস্ট ল্যাণ্ড', 'ডেড্ ল্যাণ্ড' ও 'ক্যাক্‌টাস্ ল্যাণ্ড' থেকে। সমুদ্র ও নৌ-যাত্রা ইমেজের মূলে হয়তো

একাধিক কবিই আছেন তবু নিশ্চিতই আছেন এলিয়ট্। 'প্রুফ্রক'-কবিতাটির গীতস্বরা জলকন্যা সুধীন্দ্রনাথের 'জেসন্'-সহ একাধিক কবিতার মৎস্যনারী ও জলকন্যার ছবিকে মনে করিয়ে দেয়।

মৃত্যুর ঠিক আগে এলিয়ট্-এর 'ফোর কোয়ার্টেট্স্'-এর 'বার্ন্‌ট্ নর্টন্' কবিতাটি অনুবাদ করতে শুরু করেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ একথা জানিয়েছেন তাঁর জীবনীকার।' 'বার্ন্‌ট নর্টন্' রচনাটির প্রারম্ভিক স্তবকের অনুবাদ-অংশ তাঁর মৃত্যুর পর 'কবিতা' পত্রিকার সুধীন্দ্রনাথ স্মৃতিসংখ্যায় প্রকাশিতও হয়েছিলো (আশ্বিন-পৌষ ১৩৬৭)। এলিয়ট্-কে শেষ পর্যন্তই তিনি বড় কবি বলে মানতেন। এলিয়ট্-এর 'দ্য ককটেল পার্টি' যখন প্রকাশিত হয় (১৯৫০) তখন অধিকাংশ বাঙালি কবিরই তা ভালো লাগেনি। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ তার পরও একটি চিঠিতে লিখেছিলেন যে, অধিকাংশ আধুনিক কবিই—দেশে ও বিদেশে তাঁকে হতাশ করে কিন্তু এলিয়ট করেন না—"...এ অভিযোগ শুধু বাঙালী কবিদের সম্পর্কেই খাটেনা, আজকালকার পাশ্চাত্য লেখকরাও কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছেন। একমাত্র এলিয়টই পরিণতির দিকে প্রাগ্রসর।" (৯।১।৫২-তে লেখা চিঠি ; উত্তরসূরি, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৬৭)

এর আগে দেখেছি, রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা এলিয়ট্-সচেতন করবার চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন অমিয় চক্রবর্তী। অল্প বয়স থেকেই পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিলো গাঢ়। শান্তিনিকেতনে বারো বছরের বসবাসকালে (১৯২১-১৯৩৩) বিদেশী মনীষীদের সান্নিধ্য লাভের ফলে তিনি সমকালীন পাশ্চাত্য সাহিত্য সম্পর্কেও অবহিত থাকেন। তাঁর মন ছিলো গ্রহণশীল তবে ১৯৩০-এর আগে এলিয়ট্-এর রচনার সঙ্গে সম্ভবত তাঁর তেমন কোনো পরিচয় হয়নি। সম্ভবত 'পরিচয়' পত্রিকার আবির্ভাব-সূত্রেই আরো অনেকের মতো তাঁরও এলিয়ট্-চেতনার শুরু। ১৯৩৩-এ অক্স্‌ফোর্ড-এ গিয়েই তিনি স্থাপন করলেন সমকালীন পাশ্চাত্য কবিতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ। তাঁর কবিতার রীতি বিষয়ে হপ্‌কিন্‌স্-এর নামই করা হয়ে থাকে। তিনি নিজে কিন্তু তাঁর কাব্যরীতির মুক্তছন্দ প্রীতির দিকটা বহু কবির কবিতার সঙ্গে সামগ্রিক পরিচয়ের ফল বলে মনে করতেন এবং বিশেষভাবে নাম করতেন ইয়েট্‌স্, এলিয়ট্ ও ফ্রস্ট-এর (ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮-এ লেখককে প্রদত্ত সাক্ষাৎকার)।

অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় এই সমগ্রের আহরণ বাংলা ভাষার গড়ন ও

বাংলা কবিতার ঐতিহ্যের সঙ্গে মিলে এমন একটা স্বাতন্ত্র্য এনেছিলো যে তাকে আলাদাভাবে এলিয়ট-সদৃশ বলে আর চেনা যাবে না। কাটা কাটা বাক্যবন্ধের প্রয়োগ, কথোপকথনের চাল, আবেগের সংহতি, শিল্পীর নিরাসক্তি ধরে রাখা, নাগরিক জীবনের বিবর্ণ ছবি কখনো কখনো ফুটিয়ে তোলা—এসবের মধ্যেই এলিয়ট্‌কে মনে পড়বে এবং মনে পড়বে আরো অনেককেই। সামগ্রিক বাংলা কবিতা সম্পর্কেই একথা মোটের উপর সত্য।

'পরিচয়' পত্রিকার বৈশাখ, ১৩৪২ সংখ্যায় 'দুটি ইংরেজি কবিতা' নামে অমিয় চক্রবর্তীর ছোটো একটি লেখা বেরোয়। অল্প একটু গদ্য লেখার সঙ্গে সেখানে ষ্টিফেন্ স্পেণ্ডার্ ও উইনিফ্রেড্ হোল্‌ট্‌বি-র ট্রেন-বিষয়ক দুটি কবিতার বাংলা অনুবাদ করে দিয়েছিলেন তিনি। গদ্যাংশটিতে আছে সমকালীন ইংরেজি কবিতার গতিপ্রকৃতি, ছন্দ ও ভাববস্তু নিয়ে খুব সংক্ষিপ্ত কয়েকটি মন্তব্য। লেখাটির শেষাংশ খুবই ইঙ্গিতময়—"অনেক সময় এই সঞ্চয় চিত্তের বোধনে সঞ্চারিত হয়ে প্রাণকণা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু মুক্ত মনের দরজা গিয়েছে খুলে। কম্যুনিজমের প্রেরণা এর মধ্যে আছে। এবং তারই সহোদর ফ্যাসিজ্‌মের প্রভাব—বিশেষ মানুষের মধ্যে বিচিত্র মানুষের বিবিধ ইচ্ছার অপূর্ব সমন্বয় দেখা, হোক ভালো, হোক মন্দ। হয়তো স্পেণ্ডর, ডে লিউইস চলেছেন এক পথে; এলিয়ট্ দ্বিতীয়ের সন্ধানে।" খুব শান্তভাবে বললেও ফ্যাসিজ্‌ম্-এর সঙ্গে এলিয়ট্-এর নামটি যুক্ত করে দিয়েছেন অমিয় চক্রবর্তী। এলিয়ট্-এর কবিতা ও কাব্যনাট্যের সঙ্গে ফ্যাসিজ্‌ম্-এর একটি নিগূঢ় সম্পর্কের সন্ধান তখনই যেন তিনি পেয়েছিলেন। অথচ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতে তখনও চার বছর বাকি। আর, পাউণ্ড্-এর মতো প্রত্যক্ষভাবে এলিয়ট্ ফ্যাসিস্ট্ শক্তির সঙ্গে কখনো যুক্তও হননি।

কিন্তু অমিয় চক্রবর্তী যখন কবি হিসেবে এলিয়ট্-এর শক্তি ও কাব্যজগতে তাঁর স্থান নির্দেশ করেছেন তখন সম্পূর্ণই মিটিয়ে দিয়েছেন তাঁর প্রাপ্য সম্মান। 'ফোর্ কোয়ার্টেট্‌স্-এর কবিতাগুলিতে দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ ও সৌন্দর্য তাঁর ভালো লেগেছিলো, অকুণ্ঠ ভাষায় প্রশংসাও করেছিলেন—"অন্তর্ভাবিত সেই রূপটি অতি সূক্ষ্ম আনন্দিত মূর্তি নিয়ে দেখা দিয়েছে, এলিয়টের কাব্যের গড়ন অপূর্ব ভাষায় সমন্বিত, সেই কথাই বলতে চাই।" (কবিতা, পৌষ, ১৩৫০)।

এলিয়ট্ সম্পর্কে আরো গুরুত্ব দিয়ে অমিয় চক্রবর্তী আলোচনা করেছেন তাঁর ইংরেজিতে লিখিত প্রবন্ধ-গ্রন্থ 'মডার্ন টেন্ডেন্সিজ্ ইন্ ইংলিশ লিটারেচার্'-এ। ১৯৪২-এ প্রকাশিত এই বইটিতে তিনি বিশ শতকের প্রারম্ভিক পাশ্চাত্য কবিতার আলোচনা করেছেন বিভিন্ন দিক থেকে। এলিয়ট্ সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণ পরিচ্ছেদে তিনি এলিয়ট্-এর যুগোচিত বিষাদ, প্রাচীন মূল্যবোধ সম্পর্কে মোহভঙ্গ, বৃষ্টির জন্য তাঁর প্রার্থনাময় প্রতীক্ষা, অনুষঙ্গবহুল রীতি এবং ধর্মীয় প্রবর্তনার প্রতি তাঁর ঝোঁক—এসব কিছুই ব্যাখ্যা করেছেন। কবিতার ভাষা ও ছন্দ বিষয়ক আলোচনাতেও বারবার এসেছে এলিয়ট্-এর নাম।

অমিয় চক্রবর্তীর নিজের প্রবন্ধে ব্যক্ত তাঁর যে কবিতা সম্পর্কিত ধারণা তার সঙ্গেও মিল পাওয়া যাবে এলিয়ট্-এর চিন্তার। 'সাম্প্রতিক (১৯৬৩) গ্রন্থের অন্তর্গত 'কাব্যে ধারণাশক্তি' নামে একটি প্রবন্ধে অমিয় চক্রবর্তী কবির মনে সঞ্চিত অনুভব ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়ের কথা বলেন। 'বলবার আর একটি সচেতন স্তরে' এসে পৌঁছলে তবেই কবিতা নির্মিত হয়—এই সচেতনতাটি বিশ শতকীয় কবিতার বিশেষ লক্ষণ যার প্রথম প্রবক্তাদের একজন ছিলেন এলিয়ট্। উচ্ছ্বসিত ভঙ্গির পরিবর্তে সংহত ঘনতা এবং কিছুটা এলিয়ট্-কথিত 'এস্কেপ্ ফ্রম্ পার্সোনালিটি' তত্ত্বের সমর্থনও অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় পাওয়া যায়। তবে একে এলিয়ট্-এর প্রভাব বলা হয়তো ঠিক নয়। অমিয় চক্রবর্তীর স্বভাবেই ছিলো এক গাঢ় সংহতিবোধ ও আবেগ-গভীর অনুচ্ছ্বাস। টুকরো মন্তব্য ও দৃশ্য জুড়ে একটি অখণ্ডতা নির্মাণের যে রীতি এলিয়ট্ জনপ্রিয় করে তোলেন তাও অমিয় চক্রবর্তী কখনো কখনো ব্যবহার করেছেন।

কবিতার ভাষা সম্পর্কে যে-মত পোষণ করতেন অমিয় চক্রবর্তী তাও পাউণ্ড্-এলিয়ট্-কথিত 'কমন্ স্পীচ্'-এর অনুসারী।—"যা মুখে বলি না তা কলমে লিখব না এরকম প্রতিজ্ঞার বিশেষ মূল্য আছে।" (মার্কিন প্রবাসীর পত্র, সাম্প্রতিক)। তবে অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যাদর্শে সচেতন শিল্পিতার সঙ্গেই একটি ধ্যানগাঢ় তন্ময়তার কথা পাওয়া যায় বারবার—স্রষ্টা ও সৃষ্টির একটি গভীর অবিচ্ছেদের বোধও যেন মিলে আছে। এই অনুভূতি পাওয়া যায় না এলিয়ট্-এর চিন্তায়। এই মনোগঠন ও মনো-অয়ন অমিয় চক্রবর্তীর নিজেরই।

অমিয় চক্রবর্তীর এলিয়ট্-বিচারের একটি সুপরিণত ও সুচিন্তিত নিদর্শন

পাওয়া যায় তাঁর 'উত্তর সামরিক সাহিত্য' (সাম্প্রতিক) নামের প্রবন্ধটিতে। বুদ্ধদেব বসুর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'বৈশাখী' নামের একটি বার্ষিক সঙ্কলনের জন্য লেখাটি লিখেছিলেন তিনি ১৯৪১-৪২-এর কাছাকাছি সময়ে। বিতর্কের রীতিতে নানা মতামত সেখানে তিনি উপস্থিত করেছেন। এলিয়ট্-সম্পর্কিত অভিমতটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ—"এলিয়ট-ই ট্রাডিশন নিয়ে বহু কথা বলেছেন। ভয় হচ্ছে ওঁর মধ্যে যুগধর্ম নয়, কালের বিষ ঢুকছে। শেষ পর্যন্ত হয়তো ধনিকতার তুরীয় কাব্য ফাঁদবেন,—সেটাও তো ঐতিহ্য।...তাই বলি কিছু ধ্যান, কিছু সংসার—প্রথম থেকেই মিশিয়ে রেখো।...এলিয়ট বেশি পালাতে গিয়ে বেশি জড়িয়েছেন। একান্তবাসীর হঠাৎ ইতরতা তাঁর কাব্যে আগেও দেখেছি।..." আবার ঐ লেখাটিতেই কবি-এলিয়ট্-কে শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি বলেছেন—"Aldous Huxley-র Grey Eminence এবং Eliot-এর নূতন চারটি কবিতা ছাড়া ইংরেজি সাহিত্যে একটিও কালোত্তীর্ণ হবার যোগ্য লেখা বেরোয়নি।"

সুধীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্রবর্তীসহ ঐ সময়ের কবিদের মতামতে একথাটি বারবারই বেরিয়ে আসে যে কবি হিসেবে এলিয়ট্-কে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মনে করলেও তাঁর চিন্তা, মনন ব্যক্তিত্ব ও আদর্শ বিষয়ে তাঁরা ভক্তি বা মুগ্ধতার কোনো ভাব পোষণ করতেন না। ফলে ঐ সমীপতার যুগেও এলিয়ট্-এর অনুসরণ বাংলা কবিতার রীতিকে কিছুটা স্পর্শ করেই থেমে গিয়েছিলো। কবিদের ভাবাদর্শকে খুব বেশি বিচলিত করতে পারেনি। বিষ্ণু দে সম্পর্কেও কথাটি প্রবলভাবেই সত্য।

বিচিত্র ও আশ্চর্য এক স্বাতন্ত্র্য ছিলো জীবনানন্দের। কোনো কোনো কবিতায় এড্গার অ্যালান্ পো এবং ইয়েট্স্-এর পঙক্তির প্রত্যক্ষ অনুসরণ সত্ত্বেও তাঁর কবিতা তাঁরই কবিতা থাকে, অন্যের প্রতিধ্বনি হয় না। বিচ্ছিন্ন-ভাবে এলিয়ট্-এর প্রভাব জীবনানন্দের কবিতায় খোঁজার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। সামগ্রিকভাবে বিংশ শতাব্দের পাশ্চাত্য কাব্যভাবনার সঙ্গে সমকালীন বাংলা কবিতার সৃষ্টি-প্রক্রিয়া ও ঐতিহ্য মিলিয়ে নিজের কাব্যাদর্শ গড়ে নিয়েছিলেন জীবনানন্দ। কিন্তু এরই মধ্যে এলিয়ট্-এর চিন্তা-ভাবনার প্রতি ছিলো তাঁর সমর্থন, শ্রদ্ধা এবং কিছুটা নির্ভরতাও। 'কবিতার কথা'-র (১৩৬২) প্রবন্ধগুলিতে বহু প্রসঙ্গে এলিয়ট-এর নাম ও উক্তির উদ্ধারেই তা বোঝা যায়। তিনি প্রথমেই স্বীকার করে নিয়েছেন যে, একালের কবিরা বোদ্লেয়র্ ও ফরাসি প্রতীকী কবিদের থেকে শুরু করে

ইয়েট্‌স্, এলিয়ট্, পাউণ্ড্ প্রমুখ কবিদের কাছে গিয়েছিলেন—"খানিকটা হৃদয়ের সাহচর্য ও কিছুটা অভিনবত্বের গরিমা সেসব জায়গায় খুঁজে পেয়েছে বলে।" (রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা, কবিতার কথা)

জীবনানন্দও কিন্তু অমিয় চক্রবর্তীর মতোই এলিয়ট্-মানসের সঠিক গড়নটি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সমালোচকরা অনেকেই বলতে চেষ্টা করেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ জনসাধারণের থেকে বিচ্ছিন্ন ও বুর্জোয়া সভ্যতার প্রতীক। সেই সমালোচকেরাই এলিয়ট্-এর প্রশংসা করলে তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন—"পাউণ্ড্ ও এলিয়ট্ ও বুর্জোয়া সভ্যতার জীব, এবং রবীন্দ্রনাথের চেয়ে কখনোই সেই সভ্যতার তীব্রতর সমালোচক নন······" (পূর্বোক্ত প্রবন্ধ)। এলিয়ট্-এর 'থ্রী ভয়েসেজ্ অভ্ পোয়েট্রি' নামক প্রবন্ধ-পুস্তিকাটি সমালোচনা করবার সময়েও জীবনানন্দের অনুচ্ছ্বসিত ও বিচারশীল ভঙ্গিটি ছিলো অপরিবর্তিত—"এলিয়টের বক্তৃতাটি পড়ে মনে হয় যে, কাব্য-প্রসঙ্গে তিনি পূর্বে নানা প্রবন্ধে ও পুস্তকে যেসব মতামত ব্যক্ত করেছেন তারপর তাঁর বোধহয় আর নতুন কিছু বলবার ছিল না।" (উষা, নবম বর্ষ, তৃতীয় সঙ্কলন ১৩৬১)

সব জড়িয়ে জীবনানন্দ বিশের দশকের ইউরোপীয় কবিতায় ততটা মুগ্ধ হননি। যদিও একথা তিনি অনুভব করেছিলেন যে নতুন একটি সময়ের কথা নতুন ভঙ্গিতে তাঁরা বলছেন যা একান্তই একালের। ইয়েটস্-এর পরেই তাঁর কাছে বড় কবি ছিলেন এলিয়ট্। অন্যান্যরা তেমন তাৎপর্যময় ছিলেন না। "এলিয়ট-এর 'ওয়েস্ট ল্যাণ্ড'-এর কোনো অংশকেই বাকচাল এমনকি মহনীয় চাতুর্য বললেও অন্যায় করা হবে হয়তো, কিন্তু কামিংস ইত্যাদি অনেকের কবিতা অবান্তর চাতুরী ছাড়া আর কিছুই নয়। অডেন, স্পেণ্ডর, ম্যাকনিস প্রভৃতি কবির অনেক লেখাও এই ধরনের।" (উত্তররৈবিক বাংলা কাব্য, কবিতার কথা)। এলিয়ট্-কে খুব মহৎ কবি না বললেও এখানে সৎ কবি বলে স্বীকার করেছেন জীবনানন্দ।

এলিয়ট্ ও জীবনানন্দ—দুজনেই ছিলেন সময়-সচেতন কবি। "মহা-বিশ্বলোকের ইশারার থেকে উৎসারিত সময়চেতনা আমার কাব্যে একটি সঙ্গতিসাধক অপরিহার্য সত্যের মতো,······" (কবিতা প্রসঙ্গে, কবিতার কথা)—বলেছেন জীবনানন্দ। এই উক্তিতে অনেকে এলিয়ট্-এর লেখার ছায়া দেখেন।—

"The historical sense, which is the sense of the timeless

as well as of the temporal and of the timeless and of the temporal together, is what makes a writer traditional." (Tradition and Individual Talent, The Sacred Wood) কিন্তু উক্তি দুটিতে অসাম্যও স্পষ্ট। জীবনানন্দ বলেছেন বোধের অন্তর্গত সময়চেতনার কথা, এলিয়ট্ বলেছেন ঐতিহ্যের কথা। তবু প্রবাহিত সময়ের গতি থেকে একটি সুস্থিত মাত্রা দুই কবিই নিজেদের মতো করে নিজেদের কবিতায় আনতে চেষ্টা করেছিলেন।

ঐতিহ্যের উপর যে-গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন এলিয়ট্ জীবনানন্দও স্বীকার করেছিলেন তা। 'দেশ কাল ও কবিতা' (কবিতার কথা) প্রবন্ধে তিনি বাঙালি কবি ও সমালোচকদের 'আলাওল' থেকে 'আজ পর্যন্ত' বাঙলাদেশের সামগ্রিক কবিতা পড়ে নিতে নির্দেশ দেন, জেনে নিতে বলেন সংস্কৃত কবিতার পরিপ্রেক্ষিত, ইংরেজি ও ফরাসি কবিতা সম্পর্কে 'অনুভাবের স্বচ্ছতা' রাখতে বলেন—এ সবই কবিতার ট্র্যাডিশনের সঙ্গে কবি ও সমালোচকদের সংযোগ রাখার জন্যই। কাব্য-সমালোচকদের সম্পর্কেও অনেক মন্তব্য করেছেন জীবনানন্দ। মনে পড়বে এলিয়ট্-এর 'দ্য পারফেক্ট ক্রিটিক্', 'দি ইম্পারফেক্ট ক্রিটিক্' ইত্যাদি প্রবন্ধের কথা। দুজনেই কাব্য-সমালোচকের মনে মহত্তর কাব্যবোধের জাগরণের কথা বলেছেন।

লণ্ডন্-এর নাগরিক পরিবেশ, আধুনিক সভ্যতার আপাত সপ্রতিভার অন্তঃশূন্যতা বিশেষভাবে প্রকাশ করেছেন এলিয়ট্ তাঁর প্রথম পর্বের কবিতায়। এই ভঙ্গিটি যথেষ্ট আকর্ষণ করেছিলো বিষ্ণু দে ও সমর সেনকে। জীবনানন্দও নাগরিক পরিবেশের নিষ্প্রাণতা, ভয়াবহতা, বিচ্ছিন্নতা প্রকাশ করেছেন। এলিয়ট্-এর পরিবেশ ও ইমেজ-নির্মাণ কিন্তু তাঁর বিবরণে তেমন ছায়া ফেলেনি। উপরিতলের বর্ণনা যথাযথ রেখে তার ভিতর থেকে নিরর্থকতার ভাব ফুটিয়ে তোলেন এলিয়ট্। জীবনানন্দ কখনই যথাযথ চিত্ররূপে আগ্রহ বোধ করেননি। নগরের পরিবেশ তিনি যখন রচনা করেছেন,—ট্রামলাইন, ফুটপাথ, মোটরকার, হাইড্র্যান্ট, ওভারব্রিজ, লঙ্গরখানা, ভিক্ষুক, ইহুদি রমণী, আহিরিটোলা, টেরিটিবাজার—এ সবই সেখানে এসেছে কিন্তু নিখুঁত ছবির বদলে সেখানে খানিকটা তির্যক ভঙ্গি ও খানিকটা রহস্য মিশিয়ে দিতেন জীবনানন্দ—কখনো কখনো একটি গভীর ভয়, কখনো অবর্ণনীয় ঘৃণা ;—তেমন যেন দেখা যায় না এলিয়ট্-এর কবিতায়। নগরজীবনের শূন্যতা দেখালেও স্মার্ট ভঙ্গির একটা মজাও

এলিয়ট্ রেখেছেন। জীবনানন্দের কবিতায় স্মার্টনেস্-এর কথা কখনো মনে পড়ে না। এলিয়ট্-এর কবিতায় 'ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' থেকেই আধ্যাত্মিকতার স্পর্শে উত্তরণের চেতনা লক্ষ করা যায় বলে শূন্যতাবোধের অতলতা অনুভূত হয়না ততটা। এলিয়ট্-এর কবিতায় মাঝে মাঝে নরনারীর যৌথ নৃত্যের চিত্রকল্প ব্যবহৃত হয় সাধারণতই উর্বরতা-জ্ঞাপক লোক-অনুষ্ঠান রূপে। খোলা মাঠে, আগুনকে ঘিরে, শস্য-রক্ষণ উৎসবের অঙ্গ হিসেবে একটি চমৎকার নাচের বর্ণনা আছে 'ইস্ট কোকার' (ফোর কোয়ার্টেটস্) কবিতায়। বাঙালি কবিদের মধ্যে এভাবে নৃত্যকে ব্যবহার করার রীতি কেবল জীবনানন্দের রচনাতেই দেখা যায় যেখানে সম্মিলিত হয়েছে আদিমতা, গ্রামীণতা, যৌনতা ও ভূমিজ উর্বরতার সূক্ষ্ম স্মৃতিসমূহ।

অন্যান্য সাহিত্যকর্ম ও বিভিন্ন বিষয় থেকে যে বিপুল গ্রহণের রীতি এলিয়ট্ প্রচলন করেছিলেন তা কিছুটা অনুসরণ করেছিলেন অনেকেই। অন্তত এব্যাপারে তাঁদের দ্বিধামুক্তি ঘটিয়েছিলেন এলিয়ট্। জীবনানন্দ এ জাতীয় গ্রহণে কুণ্ঠিত ছিলেন না, তবে এলিয়ট-এর মতো অনুষঙ্গের স্তূপ তাঁর কবিতায় দেখা যায় না। শেষের দিকের কবিতায় খানিকটা তালিকার মতো করে নানা নাম-পদ ব্যবহার করতেন জীবনানন্দ—এলিয়ট্-এর প্রয়োগরীতি ঠিক সেরকম নয়। কিন্তু বাক্য ও বাক্যাংশের পুনরুক্তি ঘটিয়ে যে আবেগ-স্রোত প্রবাহিত করে দিতেন এলিয়ট্ তা জীবনানন্দকে কিছুটা প্রভাবিত করেছিলো মনে হয়।

এলিয়ট্-এর কবিতার সঙ্গে রাগ-অনুরাগ মিশ্রিত একটি সম্পর্ক ছিলো সঞ্জয় ভট্টাচার্যের। ১৯৩২-এ 'পূর্বাশা' পত্রিকা নিয়ে যখন সঞ্জয় ভট্টাচার্য বাংলা কবিতার আসরে উপস্থিত হলেন তখন 'পরিচয়' পত্রিকা ও সুধীন্দ্রনাথের 'কাব্যের মুক্তি' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়ে গেছে। 'পূর্বাশা' আলাদাভাবে সাহিত্য-পত্রিকা ছিলো না। সমাজ ও সমাজতন্ত্র বিষয়ে নানা প্রবন্ধ থাকতো প্রথম পর্যায়ের 'পূর্বাশা'য়। মাঝে মাঝে সম্পাদকীয় রচনা বা অন্য আলোচনায় যখন সাহিত্য প্রসঙ্গ এসেছে সেখানে এলিয়ট-এর নাম উচ্চারিত হয়নি। খুব বেশি বিদেশী কবিতার অনুসরণ সঞ্জয় ভট্টাচার্যের মনোমতো ছিলো না মনে হয়। 'পূর্বাশা'র প্রথম পর্যায়ে বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিলো তাঁর। 'কবিতা' প্রকাশিত হবার পর তিন চার বছর সে সম্পর্ক অক্ষুণ্ণও ছিলো। তবে ১৯৩৭-৩৮-এর কাছাকাছি সে সম্পর্ক কিছুটা ব্যাহত হয়। তার মূলে নানা কারণের একটি সম্ভবত এই—অতিরিক্ত বিদেশী

কবিতার অনুসারক বিষ্ণু দে প্রশ্রয় পেতেন 'কবিতা'য়, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য—উভয়েরই অপছন্দ ছিলো এই ধরনটি। তাঁরা দুজনে যখন একসঙ্গে ১৯৪০-এ প্রকাশ করলেন 'নিরুক্ত' পত্রিকা তখন প্রথম থেকেই বিদেশী কবিতার অনুসরণের বিরুদ্ধে একটা অভিমত গড়ে তোলার চেষ্টা তাঁদের মধ্যে দেখা যায়। তখন সঞ্জয় ভট্টাচার্য 'নিরুক্ত'-র এক সম্পাদকীয়-তে (পৌষ, ১৩৪৭) লিখেছিলেন—"এলিয়ট বর্তমান যুগের দ্বিধা সন্দেহের ভীড়ে এবং যুধ্যমান ইচ্ছাগুলোর উর্দ্ধে যে এক নতুন জগতের পরিকল্পনা করেছেন তা থেকে কোনো আধুনিক বাঙালী কবি প্রেরণা লাভ করেননি, এলিয়টের দুর্বোধ্যতাকে সন্ধান করে বাংলা সাহিত্যের একদল 'বুদ্ধিজীবী' কবি দিনের পর দিন বাংলা কবিতাকে পাঠকের কাছে অস্পৃশ্য করে তুলেছেন"।

কিন্তু কালক্রমে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের এই মত কিছুটা বদলায়। হয়তো বা জীবনানন্দকে বুঝতে চেয়েই এসেছিলো সেই পরিবর্তন। জীবনানন্দের কবিতার প্রতি অনুরাগের সঙ্গে সঙ্গেই পো বা ইয়েট্স্-এর কবিতা থেকে জীবনানন্দের গ্রহণের মূল্য বোঝেন তিনি। 'নিরুক্ত', আশ্বিন, ১৩৫০-এ প্রকাশিত হয় সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'জীবনানন্দ দাশ' প্রবন্ধটি (পরে 'তিনজন আধুনিক কবি' গ্রন্থে ধৃত, ১৯৪৪)। সেই প্রবন্ধে এলিয়ট্-এর নাম না থাকলেও ইমেজিস্ট কবিদের বিষয়ে সামান্য উল্লেখ আছে। নিশ্চিতভাবেই এই সময় থেকেই এলিয়ট্ সম্পর্কে উদাসীনতা তিনি ত্যাগ করেন যার ফল হিসেবে উল্লেখ করা যায় তাঁর রচিত 'এখনকার বাংলা কবিতা' প্রবন্ধটির কথা (পূর্বাশা, ফাল্গুন, ১৩৫৭)। এই প্রবন্ধে এলিয়ট্-এর উক্তি উদ্ধার ও সমর্থন করে তিনি বলেছেন—"বহু অভিজ্ঞতা জড়ো হোক তোমার মনে—ঘনীভূত হোক, প্রগাঢ় হোক—তারপর সেখান থেকে যে নূতন একটি ফল বেরিয়ে আসবে তা-ই কবিতা।" এই প্রবন্ধটিতে আশ্চর্য একটি কাজ করেছেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য যা আর কেউ করেননি। তিনি মিল খোঁজার চেষ্টা করেছেন ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রের সূত্রের সঙ্গে এলিয়ট্-এর চিন্তার। তাঁর মতে, এলিয়ট্ যাকে বলেছেন 'এস্কেপ্ ফ্রম্ পার্সোনালিটি' তাকেই 'সাহিত্য-দর্পন'—এ বলা হয়েছে 'পরস্য ন পরস্যেতি…' ইত্যাদি। যে-কোনো কাব্যসৃষ্টির মর্মকথাই এই মনোভাব।

এর পর থেকেই আধুনিক কবিতা সম্পর্কিত আলোচনায় সঞ্জয় ভট্টাচার্য মাঝে মাঝেই এলিয়ট্-এর নাম করেছেন। পূর্বে উল্লিখিত 'জীবনানন্দ

দাশ' নামের প্রবন্ধটির ভিত্তিতে শেষ জীবনে রচিত 'কবি জীবনানন্দ দাশ' (ভারবি, ১৯৭৪) নামের গ্রন্থটিতে এলিয়ট্ এসেছেন নানা প্রসঙ্গে। দুটি উক্তি উদ্ধার করা যাক—"দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ডই (১৯২২) বস্তুত ইংরেজি কবিতার আধুনিক যুগের জয়স্তম্ভ। এলিঅট তখনই বন্ধ্যাত্মবোধ থেকে উর্বরতাবোধে এলেন।" (পৃ ১৭/১৮)। "ইয়েট্স্ বা এলিঅটের মনোলোকে ভারতীয় ভাবধারা যথেষ্ট প্রশ্রয় পেয়েছে বলে ভারতীয় কবি আপন ঐতিহ্য বিস্মিত না করেও তাঁদের হৃদয় সাহচর্য পেতে পারেন।" (পৃ ১৯)। জীবনানন্দের 'ঘোড়া' (সাতটি তারার তিমির) ও অমিয় চক্রবর্তীর 'চায়ের বেলা' (খসড়া) কবিতার চিন্তা ও গঠনের সঙ্গে এলিয়ট্ রীতির সম্ভাব্য সাদৃশ্য দেখেছেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য এই গ্রন্থেই (পৃঃ ১১১)। 'গোধূলি সন্ধির নৃত্য' (সাতটি তারার তিমির) কবিতাটিতেও লক্ষ্য করেছেন এলিয়ট্-এর সময় চেতনার ছাপ। প্রথম পর্বের 'এলিয়ট' বানানটিও তিনি পরে 'এলিঅট' করেছিলেন বিষ্ণু দে-র প্রভাবেই তাতে সন্দেহ নেই।

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের প্রথম পর্বের কবিতার নাগরিক পরিবেশজাত হতাশাবোধের সঙ্গে এলিয়ট-এর লেখার সাদৃশ্য-সন্ধান সম্ভব,—

তামাটে মাংসের ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি

... ...

রাস্তার হাওয়ায় হোটেলের শিককাবাবের গন্ধ

রাস্তার শানে ধোঁকে রোগা কুকুর আর ওরা

(ওরা, সংকলিতা)

অপর একটি কবিতায়—

দাও আমাদের আকাশকে ইস্পাতে মুড়ে—

বিদ্যুতে জ্বলুক আমাদের সূর্য,

কার্বন ডায়োক্সাইডে ভরে যাক হাওয়া,

আমরা বেঁচে থাকি ক্লাইভ স্ট্রীটের দালানে...

(প্রেতায়িত, সংকলিতা)

এই দৃশ্য ও রীতি সরাসরি এলিয়ট্ থেকে সঞ্জয় ভট্টচার্য নিয়েছিলেন অথবা গ্রহণ করেছিলেন সমর সেনের রচনা থেকে তা বলা শক্ত। পর্যায়ক্রমে বহু কবির প্রভাবই সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কবিতায় অনুভব করা যায়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতার বিস্তারের বোধ, জীবনানন্দের সময়-বোধ ও নিজস্ব রোমান্টিক চেতনা মিশিয়ে কবিতা লেখেন তিনি। এলিয়ট্-এর কাব্য-

বিষয় ও কাব্য-প্রকরণের সঙ্গে কোনো সামগ্রিক নৈকট্য সম্ভবত তাঁর রচনায় পাওয়া যাবে না।

বাঙালি কবিদের মধ্যে এলিয়ট্‌কে যদি কেউ অপছন্দ করে থাকেন তা হলে তিনি প্রেমেন্দ্র মিত্র। বিদেশী সাহিত্য তাঁর ভালোই পড়া ছিলো। বিদেশী কবিদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতেন হুইট-ম্যান-কে। তারপর লরেন্স, চেস্টারটন, ফ্রস্ট্‌ ও জাপানি কবিদের। আধুনিক যুগের সংঘাত, সংকট ও বিষাদবোধ কবিতায় থাকবে—এতে আপত্তি ছিলো না তাঁর কিন্তু একেবারেই বিরূপ চোখে দেখতেন প্রকাশ ভঙ্গির দুরূহতা ও অসরলতাকে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের নিজের রচনারীতিও সেই বিশ্বাসেরই ইঙ্গিত দেয়। এলিয়ট্‌-এর রচনাভঙ্গির অতিরিক্ত কাটা কাটা অসংলগ্ন ভাব ও নানা উৎস থেকে অবিরল গ্রহণ—যা অত্যন্ত মননশীল না হলে অনায়ত্ত থেকে যাবে পাঠকের—তা তাঁর ভালো লাগতো না একেবারেই। বিষ্ণু দের রচনা-রীতি এ জন্যই তাঁর মনোমতো ছিলো না কোনোদিন।

'নিরুক্ত' প্রকাশের প্রাক্‌-কালে রবীন্দ্রনাথকে যে-চিঠি লিখেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯৪০) তাতে ছিলো 'বর্তমান বাংলা কবিতায়' 'নকল করা বাতুলতার হুজুগ'-এর বিরুদ্ধে ক্ষোভ। ঐ পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যাতেই একদল বাঙালি কবির সমালোচনা করে প্রেমেন্দ্র মিত্র লেখেন—"নিজস্ব রীতি প্রবর্তন দূরে থাক তাঁদের বিকৃতিটাও বিদেশী আমদানী।...বিদেশী কবিদের প্রতি শ্রদ্ধা থাকা, এমন কি, তাঁদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়াও মোটেই নিন্দনীয় ও লজ্জাকর নয়। কিন্তু ইংরাজী মাতৃভাষা বলেই কোন লেখক শ্রদ্ধেয় নয়।" (পৌষ, ১৩৪৭)। এই উক্তি এলিয়ট্‌ ও এলিয়ট্‌-প্রভাবিত বিষ্ণু দে, সমর সেনকেই ইঙ্গিত করেছে, মনে হয়।

গুরুত্ব সহকারে কোনোদিনই প্রবন্ধ লেখেন নি প্রেমেন্দ্র মিত্র। কাব্যতত্ত্ব, কাব্যধর্ম ও কাব্যের নির্মাণ বিষয়ে তাঁর যেসব সংক্ষিপ্ত ও সরল মতামত ছিলো সেগুলির সঙ্গে এলিয়ট্‌-এর মতের সংযোগ তেমন ছিলো না। এলিয়ট্‌-এর নামও তিনি প্রায় করেন নি। 'একালের কবিতা' নামে একটি প্রবন্ধের এক জায়গায় বলেছেন—'ইয়েটসের মত কবিদের একপাতা ধাঁধার গভীর ইঙ্গিতময়তার কাছে এলিয়টের মত তাত্ত্বিকদের গ্রন্থাবলীর প্রাঞ্জলতা ঘোলাটে হয়ে যায় বলা কি ভুল ?' (অসংলগ্ন, ১৯৬৩)। এই মনোভাবের কোনো পরিবর্তন প্রেমেন্দ্র মিত্রের জীবনে সম্ভবত হয়নি। একটি সাক্ষাৎকারে

তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন—"পাউণ্ড আমাকে মুগ্ধ করেছেন, কিন্তু এলিঅটের দ্বারা আমি বিন্দু মাত্র প্রভাবিত হইনি।...আমাদের সময় কেউ কেউ বিদেশিদের অনুকরণে কবিতা লিখেছেন, তাঁদের ছিল ধার করা কণ্ঠ।"[৭]

এই পর্বের দ্বিতীয় যে-কবি এলিয়ট্‌কে কিছুটা প্রত্যাখ্যান করতে চেয়েছিলেন সচেতন ভাবে—তিনি বুদ্ধদেব বসু। এলিয়ট্‌ সম্পর্কে তাঁরও মনোভাব ছিলো মিশ্র ধরনের। কোনোদিনই তিনি খুব নৈরাশ্যবাদী কবি ছিলেন না। ফলে 'ওয়েস্টল্যাণ্ড' কবিতায় বিশেষ ধরনের বিপন্নতাবোধ ও বিষাদ, আবদ্ধ নগরজীবনের মালিন্য তাঁকে কখনই খুব মুগ্ধ করেনি। বুদ্ধদেবের কবিতায় প্রথম পর্বে দেখা যায় উচ্ছ্বাস—প্রেমের, সৌন্দর্যবোধের, শরীরচেতনার, বিস্ময়ের জাগরণের। এই উচ্ছ্বসিত ভঙ্গিটি আদৌ এলিয়ট্‌-এর নয়। সুধীন্দ্রনাথের শাব্দিক দুরূহতা, বিষ্ণু দে-র বাক্য নির্মাণের বাঁকানো ধরন ও দেশী-বিদেশী সাংস্কৃতিক উৎস থেকে নিরন্তর গ্রহণ—যা মনে করায় এলিয়ট্‌কে—তা বুদ্ধদেব তেমন ভালোও বাসতেন না। পরবর্তীকালে বুদ্ধদেবের কবিতায় যখন এসেছে গাম্ভীর্য ও সংহতি তাও এলিয়ট্‌-এর ধরনে নয়। এ-বিষয়ে বুদ্ধদেব বসুর নিজের ভাবনার সূত্র আমরা পেয়ে যাই তাঁর প্রদত্ত একটি সাক্ষাৎকারে—

"প্রশ্ন ॥ আপনি কি মনে করেন এলিয়টের কবিতা আপনাকে বহুলাংশে প্রভাবিত করেছে?

উত্তর ॥ এলিয়টের প্রবন্ধের দ্বারা আমি উপকৃত হয়েছি।

প্রশ্ন ॥ আধুনিক কবিতায় ক্ষেত্রে বিশেষভাবে বাংলাদেশে এলিয়টের প্রভাব কতদূর?

উত্তর ॥ সকলেই তো বলেন অনেকটা আছে। কিন্তু আমি এ বিষয়ে ভেবে দেখার অবকাশ পাইনি।"[৮]

বুদ্ধদেব বসু অস্বীকার করা সত্ত্বেও কোনো কোনো সমালোচক তাঁর এক শ্রেণীর কবিতায় এলিয়ট্‌-এর ফাঁপা মানুষদের ছায়া দেখেছেন। নগরবাসী আধুনিক, চকচকে কিছু নারী-পুরুষের ছবি এক সময়ে কিছু এঁকেছেন বুদ্ধদেব। 'দময়ন্তী' কাব্যগ্রন্থের 'চলচ্চিত্র' কবিতায় নায়ক 'রাকেশলোচন' এমনই একটি চরিত্র। 'চাঁদনির এগারো টাকার স্যুটে শোভন শরীর রাকেশলোচন' আর 'বিবাহের আশা নেই তাই' এম. এ. পড়া মেয়ে বনানী ভট্‌চায—দুজনেই সেই ফাঁপা মানুষ। আবার যুগের ছন্নছাড়া শিকড়হীনতার বোধও বহন করে তারা। এই কবিতাটির রচনায়

অসমাপ্ত বাক্যপুঞ্জের ব্যবহার, আত্মকথন-ভঙ্গি, বিক্ষিপ্ত অথচ গূঢ় সম্পর্কযুক্ত শব্দাবলী, রবীন্দ্র-পঙক্তির ইতস্তত প্রয়োগ, রাস্তা-ট্রাম-বাস-ফুটপাথ-ভিড়-সংবাদপত্র-সিনেমার উল্লেখ মিলে সত্যিই একটা এলিয়টীয় আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে। এই কবিতার পঙক্তি—

তবে এই কি জীবন
তবে এই কি জীবন
এ যে জীবনে মরণ দেখি, মরণই জীবন।

অভ্রান্তভাবে মনে করিয়ে দেয় এলিয়ট্-কে —

Death or life or life or death
Death is life and life is death
(Sweeny Agonistes)

'দময়ন্তী' কাব্যগ্রন্থের আরো দু' একটি কবিতার অংশ এলিয়ট-এর দৃষ্টিভঙ্গি স্মরণ করায়—

শান্তি নেই, চারদিকে গ্রামোফোন। আমাদের এই ঘরে
আলো নেই, চলো বাইরে যাই।
কড়া ইলেকট্রিক আলো কাঁচা চর্বির মতো শাদা
এখনি জ্বালাতে হবে। ... ...
.... পাশের ফ্ল্যাটের
উনুনের ধোঁয়া এসে নিমেষে নিঃশ্বাস
কেড়ে নেবে—অতি-উন্নাসিক সমালোচনার মতো।
(এখন বিকেল, দময়ন্তী)

এলিয়ট্-এর ধরনে নির্মিত ইমেজ দেখা যায় এখানে। আরো একটি কবিতা 'ম্যাল্-এ'—যেখানে সুসজ্জিত, অ্যাক্সেন্ট-সচেতন নরনারী, গণিকা ও লক্ষপতির সমাবেশ, জীবনের সঙ্গে ফণিমনসার বনের তুলনা এলিয়ট্-কে অনুসরণ করে। 'যে আঁধার আলোর অধিক' কাব্যগ্রন্থের অনন্ত কাল-চেতনার অভিব্যক্তির সঙ্গেও এলিয়ট্-এর মিল দেখেন কেউ কেউ। 'ইস্ট কোকার্'-এর শেষ পঙক্তি— 'In my end is my beginning'। বুদ্ধদেবও লেখেন— 'অনবরত অবসানে আরম্ভ গতির' (আটচল্লিশের শীতের জন্য)।

বুদ্ধদেব বসু এলিয়ট্-এর প্রবন্ধের দ্বারা উপকৃত হবার কথা স্বীকার করেছেন। কবিতার ভাষা বিষয়ে বুদ্ধদেবের চিন্তাকে আকার দিয়েছিলেন

অনেকটাই ইমেজিস্ট কবিরা। ইমেজিস্ট ম্যানিফেস্টো-র অনুসরণে 'দময়ন্তী' কাব্যগ্রন্থের শেষে বুদ্ধদেব একটি অন্তিম ভূমিকা সংযোজন করেছিলেন। তাতে কথ্য ভাষা ও শব্দাবলীর পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন তিনি। প্রথম সংস্করণের (১৯৪৩) পর অবশ্য ভূমিকাটি বর্জিত হয়। এলিয়ট্-এর 'ইউজ অভ্ পোয়েটরি', 'দ্য মিউজিক্ অভ্ পোয়েটরি' প্রভৃতি প্রবন্ধে জোরালোভাবে কথ্যরীতি, পুরোনো ট্র্যাডিশন ভাঙা ছন্দের নতুন রূপ, পঙক্তি সাজানোর নতুন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই সব চিন্তা বুদ্ধদেবের কাব্যরূপ-চিন্তার অঙ্গীভূত হয়েছিলো। কিন্তু কাব্যভাষা ছাড়া অন্য যে-সব বিষয়গুলির উপর খুব জোর দিয়েছিলেন এলিয়ট্—যেমন ঐতিহ্য, সময়বোধ, উত্তরাধিকার, অভিজ্ঞতার মিশ্রণ, উচ্ছ্বাসের নিবারণ, নৈরাত্মবোধ, আবেগের বস্তুগ্রাহ্য রূপ প্রতিষ্ঠা এবং ধনতান্ত্রিক সভ্যতার জীর্ণতা—কোনোটির দ্বারাই সুধীন্দ্রনাথ বা বিষ্ণু দে-র মতো আলোড়িত হননি এই হৃদয়বাদী, আনন্দবাদী, প্রেরণাবাদী কবি। ক্রমশই যে তাঁর কবিতায় বস্তুত্ব, সংহতি ও শ্রমোজ্জ্বলতা দেখা দিয়েছিলো তা শিল্প-পরিণতির স্বাভাবিক নিয়মে—এলিয়ট্-এর প্রভাবে সম্ভবত নয়।

কাব্যনাট্য রচনার সময়ে এলিয়ট্-এর কাব্যনাট্যের কথা হয়তো স্মরণে রেখেছিলেন বুদ্ধদেব বসু। কিন্তু বিষয় চয়ন, উদ্দেশ্য ও ভাষা-ব্যবহারে এলিয়ট্-এর কাব্যনাট্যের সঙ্গে তাঁর কাব্যনাট্যের খুব বেশি সাদৃশ্য পাওয়া যায় না। এলিয়ট্-এর 'কক্‌টেল্ পার্টি'-র বেশ কঠোর সমালোচনা তিনি একসময়ে করেছিলেন 'পূর্বাশা'-তে। —"এই নেতিবাদ, জীবনের এই আমূল প্রত্যাখ্যান, এমন সংক্ষিপ্ত, 'বিশুদ্ধ', অতএব অসহ্যরূপে আর কোথাও প্রকাশ পায়নি যেমন পেয়েছে এলিয়টের 'ককটেল পার্টি'তে।" (আশ্বিন, ১৩৫৮)।

কিন্তু বুদ্ধদেব বসু আন্তরিকভাবেই স্বীকার করেছিলেন, বাংলা কবিতার প্রান্তরে ইউরোপের ও যুদ্ধোত্তর যুগচেতনার হাওয়া বয়ে যেতে সাহায্য করেছিলেন এলিয়ট্। বিভিন্ন প্রবন্ধে এ সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক উল্লেখ তিনি করেছেন। প্রতিনিধিমূলক একটি অংশ থেকে তাঁর এলিয়ট্-বিচারের সংক্ষিপ্তসার পাওয়া যাবে। —"প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী সেই আঁচড়-না-পড়া বিজয়ী ইংলণ্ডের পোস্ট-ওঅর চাকচিক্যের কালেই, সাহিত্যে অন্য এক বিপ্লব এলো, আধুনিকতার অন্য এক ধারণা, অন্য অনেক অভূতপূর্ব যুগলক্ষণ। এই বিপ্লব নেপথ্যে প্রস্তুত হচ্ছিলো বহুদিন ধরেই, 'দি ওয়েস্ট

ল্যাণ্ড' নামক কিছুটা দীর্ঘকায় একটি কবিতার মূর্তি নিয়ে রঙ্গমঞ্চে যখন প্রকাশ পেলো, তখনও বিশেষ কেউ লক্ষ্য করেনি, কিন্তু মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে ফাঁপা মানুষের বাসস্থল সেই পোড়ো জমি দ্রুত এগোতে এগোতে প্রায় সমস্তটা সাহিত্যদেশ দখল করে নিলো।" (স্বদেশ ও সংস্কৃতি, ১৯৫৭)

এই সময়পর্বেরই আর একজন কবি ছিলেন অজিত দত্ত। প্রচলিত ধরনের রোমান্টিক কবিতা দিয়ে শুরু করে ক্রমে তিনি গ্রহণ করেছিলেন একটু তির্যক, সপ্রতিভ ভাষা। সমাজ-পরিপার্শ্বকে দেখার ও কবিতায় স্থান দেবার নিজস্ব একটি ভঙ্গিও আয়ত্ত করেছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর কবিতা পড়লে এলিয়ট্-কে মনে পড়ে না। তাঁর প্রবন্ধেও এলিয়ট্ উল্লেখিত হননি সেভাবে।

এলিয়ট-প্রসঙ্গে যে-কবির নাম এর মধ্যেই করতে হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পর্কিত আলোচনায় তিনি বিষ্ণু দে। বাঙালি কবিদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে বেশি নিমগ্ন ছিলেন এলিয়ট-এ।

বিষ্ণু দের এলিয়ট্-সম্পৃক্তিকে তিনটি প্রধান দিক থেকে দেখা যেতে পারে। এক, এলিয়ট্ সম্পর্কে তিনি যা লিখেছেন এবং সেসব লেখায় তাঁর কী মনোভাব ফুটে উঠেছে তা অনুধাবন করা। দুই, বিষ্ণু দে-র এলিয়ট্-অনুবাদ। তিন, বিষ্ণু দে-র নিজের কবিতা ও প্রবন্ধে এলিয়ট্-এর রচনা ও চিন্তার প্রভাব কিভাবে ক্রিয়াশীল ছিলো তা দেখা।

এলিয়ট্ বিষয়ে বিষ্ণু দে যা লিখেছেন তা কালানুক্রমিকভাবে সাজিয়ে নিলে তার পরিমাণ বোঝা যাবে।

১৯৩২ : 'পরিচয়', কার্ত্তিক, ১৩৩৯-এ বিষ্ণু দে এক সঙ্গে চারটি বিদেশী কাব্যগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করেন। তার একটি এলিয়ট্-এর 'দ্য ট্রায়াম্ফাল্ মার্চ'। যুদ্ধবিরোধী কবিতাগুলির সম্পর্কে কয়েকটি প্রশংসাসূচক বাক্য প্রযুক্ত হয়েছে।

১৯৩৩ : প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এর প্রথমে 'দ্য সেক্রেড উড'-এর 'ট্র্যাডিশন অ্যাণ্ড ইনডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট' প্রবন্ধের একটি ছত্র এবং কবিতা ও ইমোশন-সংক্রান্ত অংশটির বেশ কিছুটা ব্যবহৃত।

১৯৩৫ : 'পরিচয়', কার্ত্তিক, ১৩৪২-এ 'দ্য রক্' ও 'মার্ডার ইন্ দ্য ক্যাথিড্রাল্'-এর সমালোচনা। পরে এই রচনাটিই 'জনসাধারণের রুচি' (১৯৭৫) গ্রন্থের 'এলিয়ট প্রসঙ্গে' প্রবন্ধের চারটি ভাগের প্রথম ভাগ রূপে সঙ্কলিত।

১৯৪৪ : 'পরিচয়', কার্তিক, ১৩৫১-তে 'টি. এস. এলিয়টের মহাপ্রস্থান' নামে প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধটিই 'হোয়ট্ রুক্ষ মেণ্ট, অ্যান্ এসে অন্ টি. এস. এলিয়ট্' নামে ওরিয়েণ্ট লংম্যান্-এর মিসেলেনি নং ৩-এ প্রকাশিত হয় ইংরেজিতে অনূদিত হয়ে ১৯৪৫-এ। তারপর সঙ্কলিত হয় 'রুচি ও প্রগতি' (১৯৪৬) প্রবন্ধগ্রন্থে। পুনর্বার সঙ্কলিত হয় 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' (১৯৫২) প্রবন্ধগ্রন্থে 'এলিয়ট' নামে। সবশেষে সঙ্কলিত হয় 'জনসাধারণের রুচি' গ্রন্থে 'এলিয়টের মহাপ্রস্থান' নামে।

১৯৪৮ : 'সাহিত্যপত্র' কার্তিক, ১৩৫৫-তে 'টি, এস, এলিয়ট' নামে প্রকাশিত প্রবন্ধ। এলিয়ট্-এর ষাট বছর পূর্তি উপলক্ষে পোয়েটরি লণ্ডন থেকে প্রকাশিত রিচার্ড মার্চ ও তাম্বিমুত্তু সম্পাদিত 'টি, এস, এলিয়ট' নামক সঙ্কলনে (১৯৪৮) 'মিস্টার এলিয়ট্ অ্যামং দি অর্জুন'জ্' নামে ইংরেজিতে অনূদিত। বিষ্ণু দে অনূদিত 'এলিয়টের কবিতা' (১৯৫৩)-র প্রথম সংস্করণের ভূমিকা হিসেবে এই লেখাটি ব্যবহৃত হয়েছিলো কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে বর্জিত হয়। 'এলোমেলো জীবন ও শিল্প সাহিত্য' (১৯৫৮) প্রবন্ধ-গ্রন্থে 'টমাস স্টার্ন্‌স এলিঅট' নামে এই লেখাটি 'জনসাধারণের রুচি' গ্রন্থের 'এলিঅট প্রসঙ্গে' নামক প্রবন্ধের চারটি ভাগের দ্বিতীয় ভাগ রূপে ব্যবহৃত।

১৯৫৬ : 'চতুরঙ্গ', শ্রাবণ, ১৩৬৩-তে প্রকাশিত হয় এলিয়ট্-এর 'দ্য থ্রী ভয়েসেজ্ অভ্ পোয়েটরি' এবং 'লিটারেচার অভ্ পলিটিক্স্' গ্রন্থদ্বয়ের বিষ্ণু দে কৃত সমালোচনা। 'জনসাধারণের রুচি' গ্রন্থের 'এলিঅট প্রসঙ্গে' প্রবন্ধের তৃতীয় অংশরূপে এই লেখাটি ব্যবহৃত।

১৯৬৫ : এলিয়ট্-এর মৃত্যুর পর 'শেষ কথা' নামে প্রবন্ধ—কিন্তু তখনই কোথাও প্রকাশিত হয়নি। প্রকাশিত হলো ১৯৬৯-এ 'এলিঅটের কবিতা'র তৃতীয় সংস্করণের শেষে। সেখানে রচনাকাল দেওয়া আছে। তার আগেই রচনাটির ইংরেজি অনুবাদটি প্রকাশিত হয়েছিলো ১৯৬৬-তে ইন্ডিয়ান অক্সিজেন্ লিমিটেড্ থেকে প্রকাশিত 'ইন্ দ্য সান্ অ্যাণ্ড দ্য রেন্' নামের পুস্তিকায় 'হোমেজ টু টি, এস্, এলিয়ট' নামে বিষ্ণু দে লিখিত প্রবন্ধের দ্বিতীয়াংশ রূপে।

১৯৬৬ : পূর্বোক্ত 'ইন দ্য সান্ অ্যাণ্ড দ্য রেন্' পুস্তিকায় বিষ্ণু দে-র প্রবন্ধটির প্রথমাংশ। রচনাটি ১৯৬৫-তে লিখিত হওয়া সম্ভব। ১৯৬৬-তে অনিল বিশ্বাস রচিত এলিয়ট্-এর 'ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' কাব্যের বাংলা অনুবাদ 'পোড়ো জমি-র ভূমিকা হিসেবে কয়েকটা কথা লিখেছিলেন বিষ্ণু দে। সেখানে লিখেছিলেন—"এলিঅটের কবিতা অনুবাদ করার ইচ্ছা থেকে থেকে আমারও মনকে উত্তেজিত করে, কিন্তু ওয়েস্ট ল্যাণ্ড বাংলা ভাষায় রূপ দেবার সাহস কিছুতেই আমি অর্জন করতে পারিনি। কারণ এই বিখ্যাত, প্রায় ঐতিহাসিক কবিতাটি অত্যন্ত ইউরোপীয় সমাজ ও সংস্কৃতি নির্ভর।"

দেখা যাচ্ছে ১৯৩২ থেকে ১৯৬৬ পর্যন্ত দীর্ঘ ত্রিশ বছরের বেশি সময় ধরে নানাভাবে বিষ্ণু দে এলিয়ট্-কে নিয়ে ভেবেছেন।৯ পূর্বোক্ত সব লেখাগুলিকে একত্রে নিয়ে মুগ্ধতাসূচক উক্তিগুলি বাদ দিয়ে এলিয়ট্ সম্পর্কে তাঁর যাবতীয় মতামতকে খানিকটা সূত্রাকারে সাজাবার চেষ্টা করা যেতে পারে।

১। বিষ্ণু দে-র 'প্রুফ্রকের প্রেমগীতি' ও 'এক মহিলার ছবি' 'পাকা কবিতা'। 'বার্ণ্ট্ নর্টন্' থেকে 'লিট্‌ল্ গিডিং' "বিশ শতকের সবচেয়ে সার্থক ইংরেজি কবিতার চতুরঙ্গ।"

(এলিঅটের মহাপ্রস্থান, জনসাধারণের রুচি)

২। "এলিঅটের কাব্যে যে বেদনা, যে রোমান্টিক যন্ত্রণা" তাই তাঁকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। (তদেব)

৩। এলিয়ট্-এর কবিতায়, বিষ্ণু দে-র মতে "আমাদের সমাজের এই বিচ্ছিন্নতা কাব্যরূপ পেয়েছে।......খণ্ডচৈতন্যের এমন একাগ্র উপলব্ধি ও এমন কাব্যসমৃদ্ধ রূপ এবং তার থেকে বর্ধমান নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি কাব্যজগতে এলিঅটের দান।" (তদেব)

৪। এলিয়ট্-এর কবিতায় 'অখণ্ড চৈতন্যের অভাব' বা খণ্ডিত সমাজের অধিবাসীর সততাই প্রমাণ করে। কিন্তু এলিয়ট্ চৈতন্যের একতায় পৌঁছতে চান ফলে একদিকে ক্লাসিসিজ্‌ম্ ও পুরাণ-পটভূমি তিনি নিয়ে আসতে চান এবং অন্যদিকে গির্জা ও ধর্ম প্রতিষ্ঠানের সংলগ্নতা প্রার্থনা করেন। (তদেব)

৫। এলিয়ট্ 'আত্মসচেতনতারই মহাকবি'। "এলিঅটের কাছে বাংলা লেখকদের ঋণ গ্রহণ মুখ্যত এই আত্মসচেতনতার ক্ষেত্রে।"

(এলিঅটের মহাপ্রস্থান, এলিঅট প্রসঙ্গে-২য় অংশ, জনসাধারণের রুচি)

৬। এলিয়ট্ বিজ্ঞানে নিরুৎসাহ ছিলেন।

(এলিঅটের মহাপ্রস্থান, জনসাধারণের রুচি)

৭। এলিয়ট্ ক্যাপিটালিজম্‌-এ সন্দিহান কিন্তু "সংশোধনের......সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের চেষ্টা না করে" 'বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিস্বরূপের মতবাদ' আঁকড়ে ধরেন। ফলে তাঁর যন্ত্রণা বাড়ে।

(তদেব)

৮। ভাষার অপ্রাকৃত ব্যবহারের সমালোচনা করলেও এলিয়ট্-ও অপ্রাকৃত ভাষা ব্যবহার করেন। এবং তাঁর ভাষায় আছে ভিন্ন উৎসের অনুষঙ্গ গ্রহণের অভ্যাস।

(তদেব)

৯। সুখের মুহূর্তকেও তিনি মাঝে মাঝে স্পর্শ করেন যেমন ফোর কোয়া-র্টেট্স্‌-এ।

(তদেব)

১০। তাঁর কবিতায় ঘূর্ণায়মান বিশ্বের স্থির কেন্দ্রের প্রতীক ও নৃত্য-প্রতীক অত্যন্ত অর্থময়।

(তদেব)

১১। "মানব চৈতন্যের সমগ্রতা তাঁর কল্পনায় নেই,..... "

(তদেব)

১২। সমস্যার নিজস্ব কোনো সমাধানে তিনি পৌঁছতে পারেন না বলেই তাঁর কবিতায় দ্বিধা ব্যথিতভাবে প্রকাশ পায়।

(তদেব)

১৩। এলিয়ট্-এর "মনের গঠনে নেই অধ্যাত্মজীবীর ঐশ্বর্য; তবু তিনি ধর্মবাদী স্থায়ী বন্দোবস্তের মরিয়া ভক্ত।" কাব্যনাট্যে তাঁর ধর্মমত সাহিত্যিক বিচ্যুতির কারণ হয়েছে।

(তদেব)

১৪। বাঙালিমনের আবদ্ধতাকে আধুনিক ইউরোপের খোলা হাওয়া দিল মার্কসবাদ আর "এই ইউরোপীয় সাহিত্যের মুক্তির চেষ্টা আমাদের সাহিত্যের দিকে প্রতিভাত হল দেরিতে, বলা যায়, প্রায় টি. এস. এলিঅটের প্রান্তিক মধ্যবর্তিতায়।"

(এলিঅট প্রসঙ্গে-২য় অংশ, জনসাধারণের রুচি)

১৫। সাহিত্যের ঐতিহ্য সন্ধানের ধারণায় এলিয়ট পথিকৃৎ।

(তদেব)

১৬। "এলিয়টের আন্তর্জাতিকতা ব্যতীত তাঁর মানসের ব্যাপ্তি ও মননের তীক্ষ্ণতা বোধহয় সম্ভবই হতো না।"

(এলিঅট প্রসঙ্গে-৪র্থ ভাগ, ঐ)

এই সব উক্তি সামনে রাখলেই বোঝা যায় যে, অনুরাগী হওয়া সত্ত্বেও বিষ্ণু দে-র কাছে এলিয়ট্-মানসের স্ববিরোধগুলি এবং অভাবাত্মক দিকগুলি অজ্ঞাত ছিলো না। এলিয়ট্ সম্পর্কে বিষ্ণু দে-র অভিমতগুলির সাহায্যেই বাংলা সাহিত্যে এলিয়ট্-এর আবির্ভাবের ফলাফল বিষয়ে আমরা একটি সংহত সিদ্ধান্ত পেতে পারি।

বিষ্ণু দে-র অন্যান্য প্রবন্ধেও এলিয়ট্-এর উল্লেখ আছে। পুরোনো বাঙালি কবিদের নিয়ে যে বিভিন্ন প্রবন্ধ লিখেছেন বিষ্ণু দে তার মূলে হয়তো আছে এলিয়ট্-কথিত ঐতিহ্যসন্ধান। কবিতা ও কাব্য-বিষয় নিয়ে কবিদেরই লিখতে হবে—এলিয়ট্-এর উদাহরণেই সম্ভবত বিশেষভাবে সে প্রেরণা পেয়েছিলেন ত্রিশের দশকের বাঙালি কবিরা।

১৯৩২-৩৩ থেকেই এলিয়ট্-এর কবিতার অনুবাদ করতে শুরু করেছিলেন বিষ্ণু দে। ১৯৫৩-তে অনূদিত কবিতাগুলি গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। সর্বশেষ সংস্করণে তেইশটি কবিতা এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। কয়েকটি বিখ্যাত কবিতার অনুবাদ করেছেন তিনি, যেমন জে অ্যালফ্রেড্ প্রুফ্রকের প্রেমগান, জরায়ন (গেরোনশন), ফাঁপা মানুষ (দ্য হলো মেন), রাজর্ষিদের যাত্রা (জার্নি অভ্ দ্য মেজাই)।

অনুবাদ আক্ষরিক হবে অথবা হবে ভাবানুবাদ—তা নিয়ে বিতর্ক আছে এখনও। একেবারে আক্ষরিক হওয়া হয়তো কোনো কবিতার অনুবাদের পক্ষেই সম্ভব নয়। তবু অনুবাদে যতদূর সম্ভব মূলানুগ থাকা এবং আদি কবিতার শুদ্ধতা রক্ষার দিকেই একালের অনুবাদের প্রবণতা। এটা বোধহয় আজ ধরেই নেওয়া যায় যে, এলিয়ট্-এর অনুবাদ পড়তে যাবেন যে-পাঠক তিনি পাশ্চাত্য সাহিত্য, ধর্ম, লৌকিক অনুষ্ঠান সম্পর্কিত অনুষঙ্গগুলির সঙ্গে পরিচিত হবার মন নিয়েই যাবেন। এলিয়ট্ অনুবাদে তিনি এলিয়ট্-কেই চাইবেন, তার পরিবর্তে সুলিখিত একটি ভারতীয় কবিতা নয়।

বিষ্ণু দে-র এলিয়ট-অনুবাদ নিয়ে এই সমস্যাটি দেখা দেয়। বিষ্ণু দে খ্রিস্টীয় সংস্কারকে ভারতীয় সংস্কারে পরিণত করতে চান—কখনো শৈব, কখনো বৈষ্ণব অনুষঙ্গ নিয়ে আসেন। বলা বাহুল্য 'ভার্জিন'-কে 'দেবকী-

মাতা' ও 'মেরী'-কে 'শ্রীরাধা' 'স্যাণ্ড'-কে 'কালিন্দীর বালুতীর' আর 'এগজাইল'-কে 'দ্বারকায় নির্বাসন' বললে একটি খ্রিস্টধর্ম-অবলম্বিত কবিতা সম্পূর্ণ বিচ্যুত হয় তার প্রসঙ্গ থেকে। 'অ্যাশ্‌ ওয়েড্‌নস্‌ডে' কবিতার অনুবাদে এসবই করেছেন বিষ্ণু দে। অনুতাপ ও উপবাসের চল্লিশ দিন ব্যাপী ব্রত লেণ্ট্‌। তারই প্রথম দিন অ্যাশ ওয়েড্‌নস্‌ডে-কে যদি বর্ষ-বোধন উৎসব 'চড়ক' বলে অনুবাদ করা হয় তাহলে আদৌ সেটি অনুবাদ থাকে না। হয়ে যায় অন্য একটি কবিতা।

সর্বত্রই যে তিনি এভাবে অনুবাদ করেন তা নয়। 'জে অ্যালফ্রেড্‌ প্রুফ্রকের প্রেমগান' কবিতায় সামাজিক পরিবেশে এই জাতীয় পরিবর্তনের অবকাশ ছিলো কম। যেটুকু বা ছিলো তাও করেন নি তিনি। 'প্রিন্স হ্যাম্‌লেট্‌'-কে 'রাজকুমার হ্যাম্‌লেট্‌' এবং 'লাজারস্‌'-কে 'লাজারস্‌'-ই রেখেছেন। এই কবিতার প্রতিটি পঙক্তিই মূলানুগ ও যথাযথ হয়ে সুন্দর। একটু উদাহরণ দেওয়া যায়।

The yellow fog that rubs its back upon the window panes
The yellow smoke that rubs its muzzle on the window-panes
Lic-ked its tongue into the corners of evening
Lingered upon the pools that stand in drains.......

হলদে কুয়াশা তার পিঠ ঘষে শার্শি জানালায়,
হলদে ধোঁয়াটা তার নাক ঘষে শার্শি জানালায়
জিভ দিয়ে সন্ধ্যাটাকে চাটে খাঁজে খাঁজে,
নর্দমার জমা জলে থমকে দাঁড়ায়।

অথচ এর পরেই 'গেরোন্‌শন্‌' অনুবাদ করতে গিয়ে তিনি মূল কবিতার 'ড্রাই মান্‌থ্‌' ও 'ওয়েটিং ফর্‌ রেন্‌'-কে বদলে কেন 'ভিজে ভাদুরে বাদল' ও 'রৌদ্রের আশা' করলেন তা বোঝা যায় না। 'গেরোন্‌শন্‌' ও 'হু হলো মেন' কবিতা দুটি নাম ও অনুষঙ্গের ভারতীয়করণে বেশ অদ্ভুত চেহারা পেয়েছে অনুবাদে। এ-সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন শঙ্খ ঘোষ (শারদীয় 'বিভাব' ১৯৮৮)। এ বিষয়ে বিষ্ণু দে-র একটি বক্তব্যও ছিলো যা তিনি প্রকাশ করেছিলেন অনুবাদ সঙ্কলনটির প্রথম সংস্করণের ভূমিকায়— প্রতীকী রীতি নিহিত স্বাধীনতার বশে 'জার্নি অভ দ্য মেজাই' কবিতার অনুবাদে গান্ধীর দ্বিতীয় আন্দোলনের স্মৃতি মেশে," 'কোরিওলান্‌'-এ ইনটেরিম্‌ সরকারের অনুষঙ্গ ও 'গেরোন্‌শন্‌'-এ বিষ্ণু দে নিয়ে আসেন

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, গান্ধীর অনশন ও তরুণদের প্রাণাহুতির স্মৃতি। প্রতীকী রীতির কবিতায় সবরকম স্বাধীনতা কবির থাকতে পারে কিন্তু যে-স্বাধীনতা যে অনুবাদ কবিতার বেলার সর্বাংশে প্রযোজ্য নয়—একথা বিষ্ণু দে মনে রাখেননি। ফলে এলিয়ট বিচ্যুত হয়ে যান নিজের কবিতা থেকে, এসে যায় আধুনিক ভারত। যেখানে এসব চেষ্টা চাপিয়ে দেননি বিষ্ণু দে সেখানে অনুবাদ হয়েছে স্বচ্ছন্দ সুন্দর। 'জে অ্যালফ্রেড্ প্রুফ্রকের প্রেমগান' এর শেষ অংশটি সামনে রাখলেই তা দেখা যাবে।—

I have seen then riding seaward on the waves
combing the white hair of the waves blown back.
When the wind blows the water white and black
We have lingered in the chambers of the sea
By the sea girls wreathed with sea-weed red and brown
Till human voices wake us, and we drown

তাদের দেখেছি ঢেউ চেপে যায় তারা সমুদ্রে সওয়ার
প্রত্যাহত ঢেউদের শুভ্রকেশ চড়িয়ে আঁচড়িয়ে ঊর্মিল
যখন বাতাস হানে জলরাশি শুভ্র আর ঘনকৃষ্ণনীল
আমরা অনেককাল কাটিয়েছি সমুদ্রের মহলে মহলে,
সমুদ্রকন্যার রক্তিম পাটল সমুদ্র শৈবাল মাল্য
পরায় গলায়
যতক্ষণ না মানুষের কণ্ঠস্বরে জেগে উঠি ডুবে মরি
জলের তলায়॥

বিষ্ণু দে-র কবিতায় এলিয়ট-এর কোনো প্রভাব সঞ্চারিত হয়েছিল কিনা—এ প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মনে হয়—সে প্রভাবের সন্ধান করতে হবে পঙক্তিগত সাদৃশ্যের নয়, মনোভঙ্গির সাদৃশ্যে।

উনিশ শতকের শেষে ফ্রান্সের প্রতীকী কবিতার আন্দোলন, ইউরোপের সর্বত্র বিশ শতকীয় কবিতার নবতর প্রবাহ এবং বাংলার রবীন্দ্রোত্তর কবিতাকে রোমান্টিক কবিতারই পর্বান্তর বলে আমরা চিনে নিতে পারি। কিন্তু প্রভেদও একটু আছে। উনিশ শতকীয় রোমান্টিক কবিতার কল্পনায় ও ভাষায় অতীন্দ্রিয়তার দিকে ঝোঁক ছিলো বেশি। কূলছাপানো স্রোতের মতো ছিলো বহতা আবেগ। নব্য রোমান্টিক কবিতাবলীর দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রকাশ ভঙ্গি সে তুলনায় বেশ কিছুটা মনন-শাসিত, অনেকটা সাবয়ব। কবিতার সঙ্গে স্ব-ব্যক্তিত্বকে জড়িয়ে নেবার ধরনটি অনেকটা সংযত। কবিতার গঠনেও প্রাচীন ঐতিহ্য থেকে বহু গ্রহণের ফলে একটু ক্ল্যাসিক ভঙ্গির ছাপ। এলিয়ট্-এর প্রবন্ধ ও কবিতা থেকেই এইসব আদর্শ অনেকটা

লাভ করেছিলেন ত্রিশের দশকে প্রধান হয়ে ওঠা বাঙালি কবিরা। নিজেদের কবিতায় নিজেদের ধরনে কম বেশি তাঁরা এই আদর্শগুলি গ্রহণ করেছিলেন। তাতে অবশ্য কারোরই স্বাতন্ত্র্য ক্ষুন্ন হয়নি। বিষ্ণু দে-র কবিতার মধ্যেও আছে তাঁর নিজস্ব গ্রহণ। সেই গ্রহণের মূল দুটি সূত্র সুধীন্দ্রনাথ দত্ত চমৎকার ভাবে নির্দেশ করেছিলেন বিষ্ণু দে-র 'চোরাবালি' কাব্য গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় (১৯৩৭)—"...এ রকম নৈরাত্ম উপকরণে এতখানি স্বকীয়তার সৃষ্টি আমার পরিচিত কোনো ও বাঙালী কবির সাধ্যে কুলায় না, ... " এবং "বিষ্ণু দে-র মতো এলিয়ট্-ভক্ত কখনও নিছক অন্তঃপ্রেরণার তাড়নে কাব্য লেখেন না, ভাবাবেশের উপযোগী বহিরাশ্রয়ের সন্ধানে আধুনিক সংস্কৃতির দিগ্বিদিকে বেড়িয়ে আসেন।" অত্যন্ত সংক্ষেপে এই দুটি উক্তিতে 'এস্‌কেপ্ ফ্রম্ পার্সোনালিটি' ও 'অব্‌জেক্টিভ্ কোরিলেটিভ্'—দুটি প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। বিষ্ণু দে-র কবিতায় আগাগোড়াই এই দুটি গুণের বিরল সমন্বয় লক্ষ করা যায় এবং প্রায় সর্বত্রই এই সমন্বয় হয়েছে কাব্য গুণান্বিত।

এই সঙ্গেই বিষ্ণু দে-র কবিতায় মিশেছিলো এলিয়ট্-এর নগর-চেতনা, ঐতিহ্য-চেতনা। এলিয়ট্-এর কাব্য ভাষার অনুষঙ্গ-প্রবণতা, নাম শব্দের প্রয়োগ ও অন্য সাহিত্যকদের কাছ থেকে গ্রহণের রীতি খুবই মুগ্ধ করেছিলো তাঁকে। সেই সঙ্গেই ধনতান্ত্রিক সভ্যতার আবশ্যিক সৃজন নগর সম্পর্কে অন্তঃসারশূন্যতার যে-বোধ এলিয়ট্-এর ছিলো তা-ও প্রথম পর্বের কবিতায় গ্রহণ করেছিলেন বিষ্ণু দে। তাঁর 'টপ্পা ঠুংরি' (চোরাবালি) ও 'জন্মাষ্টমী' (পূর্বলেখ) কবিতা দুটির উল্লেখ করেছেন অনেকেই।

আশে আর পাশে, সামনে পিছনে
সারি সারি পিঁপড়ের সার,
মানিনি আগে, ভাবিনি কখনো
এত লোক জীবনের বলি,
জানিনি আগে
জীবিকার পথে পথে এত লোক,
এত লোককে গোপনসঞ্চারী
জীবন যে পথে বসিয়েছে জানিনি মানিনি ,...

(টপ্পা-ঠুংরি)

এই বর্ণনায় মনে পড়ে 'ওয়েস্ট ল্যাণ্ড'-এর লণ্ডন ব্রিজের উল্লেখ—

A crowd flowed over London Bridge, so many,
I have not thought death had undone so many.

'জন্মাষ্টমী' কবিতায় 'বাষ্পগন্ধ স্পন্‌জ্ হাতে সন্ধ্যার ধোঁয়ায় মূর্তি' উঠে আসার ছবিতে 'লাভ্ সঙ অভ্ জে অ্যাল্‌ফ্রেড্ প্রুফ্রক্' কবিতার ইথারে অজ্ঞান হওয়া রোগীর মতো সন্ধ্যার উপমাটি ছায়া ফেলেছে। 'তাস খেলা'র বিবরণে 'ওয়েস্ট্ ল্যাণ্ড'-এর 'গেম্ অভ্ চেস্' হয়েছে পূর্বস্মৃতি। এই ধরনের সাদৃশ্য ও বিষ্ণু দে-র অনুষঙ্গ-প্রবণ রীতির কথা মনে রেখেই সমালোচক বলেছিলেন যে, তিনি এলিয়টি রীতিতে এলিয়ট্-কেও অতিক্রম করে যান— 'In allusions he out-Eliots Eliot' [১০]

কিন্তু বিষ্ণু দে-র কবিতাকে কখনই মনে হয় না এলিয়ট্-এর প্রতিধ্বনি। অবিরল সর্বদেশীয় পরিগ্রহণ সত্ত্বেও নিজস্ব সমাজ, দেশ ও সংস্কৃতির সঙ্গেও একটা নিবিড় যোগ রেখে গেছেন তিনি। কিছু কিছু অংশের সাদৃশ্যের কথা মনে পড়লেও 'জন্মাষ্টমী' কবিতাটির পুরাণ-শক্তিময় আবহ কোনো অর্থেই প্রভাবিত বলে মনে হয় না। বিষ্ণু দে ও এলিয়ট্-এর কবিতার নিহিত রসাবেদনেই আছে পার্থক্য। এলিয়ট্-এর মতো দিব্যতায় বা ধর্মপ্রতিষ্ঠানে বিশ্বাস ছিলো না বিষ্ণু দে-র। বিষ্ণু দে-র জনসমাজ সংলগ্নতার দৃঢ় ধারণায় বীতস্পৃহ ছিলেন এলিয়ট্।

কিছুদিনের মধ্যেই এলিয়ট্-প্রভাবিত প্রত্যক্ষ চিত্রকল্প ও বাক্যাংশের প্রয়োগ বর্জিত হয়েছিলো বিষ্ণু দে-র কবিতা থেকে। তিনি হয়ে উঠেছিলেন মননস্পর্শী কিন্তু সহজতর। তাঁর কবিতায় এসে মিশেছিলো আরো অনেক সমাজসচেতন ও বিশ্বসচেতন কবির রচনা সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা— বিশেষত এলুয়ার ও আরাগাঁ তাঁকে ভাবিয়ে ছিলেন। কোনো একটি উৎসের সীমা বা একজন কাব্যগুরু আঁকড়ে থাকার মতো কবি বিষ্ণু দে ছিলেন না। তবে তাঁর এই নিজস্ব জগতের পথটি অনেকটাই এলিয়ট্-এর সাহায্যে কাটা হয়েছিলো তাতেও সংশয় নেই কোনো।

ত্রিশের দশকের আরও একজন কবি যাত্রা শুরু করেছিলেন এলিয়ট্ ও পাউণ্ড্-কে মনে রেখে। ১৯৩৩-৩৪ থেকেই কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন সমর সেন, যখন বাঙালি পাঠকদের মধ্যে ঢেউ তুলেছে 'পরিচয়' পত্রিকা। ইংরেজি সাহিত্যের মেধাবী ছাত্র, সাহিত্যমনস্ক এই কবির পূর্বোক্ত দুই কবির প্রতি অনুরাগ অবিচল ছিলো শেষ পর্যন্তও। অসংহত আবেগোচ্ছ্বাসের প্রতি বীতরাগ, নাগরিকতা-সচেতন, বুদ্ধিবাদী সমর সেনের কাব্য-প্রকরণে

প্রথম থেকেই কিছুটা এলো এলিয়ট্-এর সচেতন, আপাতনিরাসক্ত ভঙ্গি। তাঁর কবিতার তালহীন গদ্যছন্দ ও বাগ্রীতির অবাধ মিশ্রণে প্রথম থেকেই সমর্থিত ছিলেন এলিয়ট্। নাগরিক সভ্যতার নৈরাশ্য ও ধ্বংসোন্মুখতা তুলে ধরেছিলেন তিনি এলিয়ট্-এর মতোই। মহানগরীর 'বিবর্ণ দিন, তারপর আলকাতরার মতো রাত্রি', 'গলানো 'পিচের গন্ধ', 'ঘড়ির কাঁটায় মন্থর মুহূর্তের আবর্তন'-এর বর্ণনা এলিয়ট্-কে অনুসরণ করেছে। সমর সেনও দেখেছেন—

রসহীন ফণিমনসায়, রুক্ষ বাহুতে
প্রাণের প্রতিরোধে চক্রান্ত চলে।

(শবযাত্রা. সমর সেনের কবিতা)

সেই সব ফাঁপা মানুষেরা অন্য চেহারায় সমর সেনের কবিতাতেও এসেছে যারা 'কাঁচা ডিম খেয়ে প্রতিদিন দুপুরে' ঘুমোয় আর 'পেস্তাচেরা চোখ মেলে' খবরের কাগজে পড়ে উত্তেজক খবর। 'চার অধ্যায়' (কয়েকটি কবিতা) কবিতাটিতে 'ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' কবিতার কিছু ভাবাত্মক অনুসাম্য লক্ষ করা যাবে। 'সাইকেলে ফেরা কেরাণী' 'স্যাকারিনের মতো মিষ্টি মেয়ের প্রেম' ইত্যাদি। 'এপ্রিলের বসন্ত ক্ষুধিত জাগুয়ারের মতো' হয়তো বহন করে 'April is the cruellest month'-এর স্মৃতি। কিন্তু একই সঙ্গে লক্ষণীয় যে এ কবিতায় 'ওয়েস্ট্ ল্যাণ্ড'-এর উত্তরণ নেই এবং 'ওয়েস্ট্ ল্যাণ্ড্' পরবর্তী কবিতার সুরও সমর সেনের কবিতার বিষয়বস্তুতে প্রতিফলিত হয় না। যদিও 'ফোর কোয়ার্টেট্স্'-এর কবিতাগুলির এলিয়ট-কৃত আবৃত্তি ভালো লাগার কথা তিনি বারবার নানাজনকে জানিয়েছিলেন চিঠিতে।

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার এই প্রথম পর্যায় সব জড়িয়ে এলিয়ট্-অনুরাগের ছবিটিই তুলে ধরে। রবীন্দ্রোত্তর কবিতার আকাশে একদিকে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, অন্যদিকে ইউরোপীয় কবিদের একটা মিলিত রূপ যার প্রধান প্রতিনিধি ছিলেন এলিয়ট্। এলিয়ট্-এর প্রবন্ধ, কবিতা ও ব্যক্তিত্বের সাহায্যেই বাঙালি কবি ও পাঠকের সামনে বিশেষভাবে খুলে গেল আধুনিক ইউরোপীয় কাব্যজগতের দরজা। মেটাফিজিক্যাল কবিরা, ডান এবং ওয়েবস্টার, বোদলেয়র, জুল লাফর্গ, ত্রিস্তান করবিয়ের, ফিলিপ ম্যাসিঞ্জার, ফরাসি সিম্বলিস্ট্ কবিগোষ্ঠী, গোতিয়ে, র‍্যাঁবো, মালার্মে, ভালেরি, ইঙ্গ-মার্কিন ইমেজিস্ট কবি—সকলের সম্পর্কে একসঙ্গে তাঁরা যেন সচেতন হয়ে উঠলেন। এই সচেতনতার মূলে অনেকটাই ছিলো এলিয়ট্-এর লেখা।

একই সঙ্গে নিজেদের ঐতিহ্য সম্পর্কেও তাঁরা জেগে উঠলেন নতুন করে। কাব্য রচনায় সচেতনতা, ঐতিহ্য অঙ্গীকার, ইতিহাসবোধ, বাস্তব বহিরাশ্রয়, আত্মমুখী উচ্ছ্বাসের বদলে নৈর্ব্যক্তিকতা, আবেগাতিরেকের জায়গায় সংহতি, বহুপাঠনির্মিত রচনারীতির মূল্য, নতুন ধরনের ভাষা-ছন্দ-চিত্রকল্প নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা এবং দুরূহতার মুখোমুখি হতে কুণ্ঠিত না হওয়া—এ সবই কিছু কিছু এসেছিলো এলিয়ট্-এর রচনাবলী থেকে; সেই সঙ্গেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ধনতান্ত্রিক সভ্যতার ফাঁক ও ফাঁকিগুলি কবিতায় কিভাবে উঠে আসতে পারে তাও ধরা পড়লো তাঁদের চোখে। এতদিন বাঙালি কবিদের সামনে ছিলো ইংল্যাণ্ডের কবিতা ও মূল্যচেতনা। যা তখনও ছিলো কিছুটা রক্ষণশীল। এলিয়ট্ এনে দিলেন আমেরিকার হাওয়া—যথার্থ কন্টিনেন্টাল্ পরিবেশ। সেই মানুষেরা—যাদের টাকা আছে, প্রশান্তি নেই; তাৎক্ষণিক ভোগ আছে, অন্তরের সুখ নেই; দিন কাটানো আছে, জীবনযাপন নেই—সেই সব চকচকে অথচ শূন্যচিত্ত নরনারীকে যেভাবে দেখতে পাচ্ছিলো পুঁজিবাদী আমেরিকা সেভাবে দেখেনি ইংরেজ। এলিয়ট্-এর কবিতায় তা প্রায় একই সঙ্গে দেখলো ইংল্যাণ্ড ও ভারত। এলিয়ট্ আদৌ সমাজতন্ত্রবাদী ছিলেন না কিন্তু ধনতন্ত্রের সংকটকে ঠিকই বুঝেছিলেন। তাঁর সমাধানটি অবশ্য মেনে নেননি বাংলার কবিরা কিন্তু ভাঙনের স্বরূপটি এলিয়ট্-এর কবিতাতেই তাঁরা সবচেয়ে স্পষ্টভাবে দেখেছিলেন তাতেও সন্দেহ নেই।

বিশের দশকের মাঝামাঝি থেকেই বামপন্থী চিন্তাভাবনা ভারতে তথা বাংলায় দানা বেঁধে উঠতে থাকে। সাহিত্যিকদের মধ্যে সেই চেতনার প্রথম অভিব্যক্তি ঘটে ১৯৩৬-এ নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠায়। তার আগে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'পরিচয়' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে একত্র হয়েছিলেন নীরেন্দ্রনাথ রায়, সুধী প্রধান, সুশোভন সরকার, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ লেখক ও সমালোচকবৃন্দ। এঁরা ছিলেন মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কবিজীবনের প্রথম পর্বও ছিলো সমাজতন্ত্রমুখী ও হিট্‌লার-বিরোধী। বিষ্ণু দে ও সমর সেন মতবাদের দিক থেকে ছিলেন মার্কসবাদের যুক্তি, সমাজ-সংলগ্নতা, শ্রেণীবিভক্ত সমাজ-ধারণার প্রতি মনোযোগী। তত্ত্বগতভাবে ধনতান্ত্রিক সভ্যতার পতন ও শোষণহীন, নতুন জনসমাজের উৎপত্তি সম্পর্কেও হয়তো তাঁরা আস্থাশীল ছিলেন কিন্তু কবিতার জগতে এলিয়ট্, পাউণ্ড্ প্রমুখ কবিদের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা

ছিলো অটুট। এই অবস্থাটি ত্রিশের দশকের শেষের দিক থেকেই কিছুটা জটিলতার সৃষ্টি করতে থাকে—যার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে এলিয়ট্-এর নাম।

মার্কসবাদীদের অনেকেই এলিয়ট্-এর ভাব ও ভাবনা-বলয় পছন্দ করতে পারেননি। এলিয়ট্ প্রথম পর্বে জোর দিয়েছিলেন নৈরাশ্যবাদ ও ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতার উপর। দ্বিতীয় পর্বে দেখা যায় রাজতন্ত্র ও ক্যাথলিক্ চার্চ্-এর প্রতি আনুগত্য। দুটি মানসিকতাই বর্জনীয় ছিলো মার্কসবাদীদের কাছে। যে-সময়ে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধে এলিয়ট্ গুরুত্বপূর্ণ স্থান পাচ্ছেন ঠিক সেই সময়েই নীরেন্দ্রনাথ রায় ছিলেন এলিয়ট্-বিরোধী। এর ইঙ্গিত দিয়েছেন হিরণকুমার সান্যাল—"আধুনিক কাব্য প্রসঙ্গে এলিয়ট-এর নাম উঠতে বাধ্য। পরিচয়-এর বৈঠকে এলিয়টকে নিয়ে তর্ক বিতর্কে নীরেন রায় যেসব মন্তব্য প্রকাশ করত তার মধ্যে ফুটে উঠত এখনকার বামপন্থী সমালোচনার পূর্বাভাস।"[১১]

ত্রিশের দশক থেকে যাঁরা কবিতা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে যে-কবিদের মনের টান ছিলো সমাজতন্ত্রবাদের দিকে তাঁদের অনেকেই এলিয়ট্-এর রচনারীতি ও মনোভঙ্গিকে নিজেদের লেখার আদর্শরূপে কোনো অর্থেই গ্রহণ করেননি। অরুণ মিত্র, বিমলচন্দ্র ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, চঞ্চল কুমার চট্টোপাধ্যায়, দিনেশ দাস, মণীন্দ্র রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় বা মানসিকতায় এলিয়ট্-এর ছায়া পড়েনি বলেই মনে হয়। তাঁদের কবিতায় বিবর্তন ঘটেছে কিন্তু কোনো বাঁকেই তা আলাদাভাবে এলিয়ট্কে স্মরণ করেনি। সামগ্রিক ভাবে পশ্চিমি কবিতা থেকে যেটুকু সচেতনতা বাংলা কবিতা আহরণ করেছিলো—এঁদের কবিতায় এলিয়ট্-এর ছাপ তার বেশি কিছু ছিলো না। তবে কবি হিসেবে এলিয়ট্-এর উচ্চস্থান স্বীকার করতেন সকলেই।

সমস্যাটা ছিলো বিষ্ণু দে ও সমর সেনকে নিয়ে। ১৯৩৮-এর ডিসেম্বরে নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সঙ্ঘের দ্বিতীয় সম্মেলন হয় কলকাতায়। এই সভায় সমর সেন পড়েছিলেন 'ইন্ ডিফেন্স্ অভ্ দ্য ডেক্যাডেন্টস্' নামে একটি প্রবন্ধ যেটি প্রগতি লেখক-সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় মুখপত্র 'নিউ ইন্ডিয়ান্ লিটারেচার্'-এ ১৯৩৯-এ মুদ্রিত হয়। প্রবন্ধটিতে লেখক মধ্যবিত্ত সমাজের ক্ষয় সম্পর্কে সচেতন থেকেও মধ্যবিত্ত মনোভঙ্গিকে অনেকটাই সমর্থনও করেছিলেন। এলিয়ট্ উল্লেখিত হয়েছিলেন লেখাটিতে—"...it will not be superfluous to remind that Eliot is often condemned for

this obscurity and is the one poet who is convinced to his bones of the decay of all civilisation." বামপন্থী সমালোচকদের এলিয়ট্-বিরুদ্ধতার কথা জানতেন সমর সেন। তা সত্ত্বেও তিনি এলিয়ট্‌কে আধুনিক ইংরেজি কবিতার অগ্রদূত (pioneer) এবং প্রগতিশীল (progressive) বলে গণ্য করেছিলেন। তাঁর যুক্তি—"To be really progressive in our time and in our country, where only a fraction is literate, is to preserve the integrity of what is good in our past tradition ... To be able to preserve one's personal integrity as a poet will help the progressive cause in the long run."

চল্লিশের দশকের একদল বামপন্থী সমালোচক এই সময়ে একই সঙ্গে বিরুদ্ধতা করলেন বিষ্ণু দে, সমর সেন ও এলিয়ট্-এর।

'সাহিত্যপত্র' পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় (শ্রাবণ ১৩৫৫) বিষ্ণু দে বুদ্ধদেব বসুর 'অ্যান একর্ অভ্ গ্রীন্ গ্রাস্' গ্রন্থটির সমালোচনা প্রসঙ্গে প্রশংসা করেছিলেন এলিয়ট্-এর। সেই লেখাটির বিরুদ্ধ একটি আলোচনায় প্রদ্যোৎ গুহ তীব্রভাবে বলেছিলেন—"যতই নিরপেক্ষতার ভান করুন না কেন, বিষ্ণুবাবু তৃতীয় পক্ষ নন, তিনি শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধ পক্ষ, তিনি একজন বুর্জোয়া ভাববাদী। ... এই জন্যই শুধু অচিন্ত্য নয় এলিয়টের মধ্যেও তিনি 'জীবনের অঙ্গীকারের স্পষ্ট ছন্দ' দেখতে পান। এই জন্যই তাঁর কলাকৌশল কাব্য থেকে জনগণকে বিচ্ছিন্ন রাখার কৌশল।" (মার্কসবাদী, প্রথম সঙ্কলন, অক্টোবর, ১৯৪৮, ঊর্মিলা গুহ নামে প্রকাশিত)। 'ডাক' পত্রিকার ১৩৫৬-র শারদ সংখ্যায় স্বদেশ বসু (শান্তি বসুর ছদ্মনাম) 'প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা' প্রবন্ধে লিখেছিলেন—"অতীতের মোহ বিস্তার করে বর্তমানের সমস্ত আশা ও আন্দোলনকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে চান এলিঅট।"

সমর সেনের পূর্বোক্ত প্রবন্ধটিকে ধরেই একটি বিস্তৃত প্রতিবাদী প্রবন্ধ লিখেছিলেন সরোজ দত্ত। একটু প্রশস্ত একটি উদ্ধৃতি দিলে এলিয়ট্-সম্পর্কে এই গোষ্ঠীর মনোভাবটি স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে।— "নিজের কাব্যের বৈপ্লবিকতা সপ্রমাণের জন্য শ্রীযুত সেন ইংরেজ কবি T. S. Eliot-এর নাম করিয়াছেন কিন্তু এ কথাটি সুকৌশলে চাপিয়া গিয়াছেন যে T. S. Eliot নিজেকে কোনোদিন marxist বলেন নাই, বরঞ্চ তাহার সাম্যবাদ-বিরোধিতা যে Roman Catholic Church ও মধ্যযুগীয় রাজতন্ত্রে বিশ্বাসে

আসিয়া ঠেকিয়াছে, তাহা তিনি স্পষ্ট রূপেই স্বীকার করিয়াছেন। এ উক্তি তাঁহার সাহিত্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ সুসমঞ্জস। ব্রিটিশ Decadence-এর সর্বশ্রেষ্ঠ পদকর্তা T. S. Eliot নিষ্কলুষ Decadence-এর সুদীর্ঘ পদাবলী রচনা করিয়া গেলেন অথচ তিনি Roman Catholic Monarchy-তে বিশ্বাসী। বলা বাহুল্য, সাম্যবাদের শত্রু, চিরজীবন ধরিয়া তিনি Decadence নিঙড়াইয়া গেলেন, এক ফোঁটা বিপ্লব পাওয়া গেল না।" (অগ্রণী, এপ্রিল, ১৯৪০)।

এই প্রবন্ধের উত্তরে সমর সেনও পুনরায় একটি প্রবন্ধ লিখে নিজেকে সমর্থন করেছিলেন 'অগ্রণী' পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় (মে, ১৯৪০)। এই প্রবন্ধটিতে এলিয়ট্ সম্পর্কে তাঁর চিন্তার কিছু নতুন দিক আছে বলে প্রাসঙ্গিক অংশটি উদ্ধার করা দরকার—"আমার প্রবন্ধে এলিয়টকে বিপ্লবী কবি বলা হয়নি, তবে এটা বলা হয়েছে যে আধুনিক প্রগতিক ইংরেজ কবিদের উপর তাঁর প্রভাব অসামান্য। অডেন প্রমুখাদি সাম্যবাদী কবিরা এলিয়টের প্রভাব এবং ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকার করতে কখনো কার্পণ্য করেননি, এবং সাহিত্যে যে অন্তর্দৃষ্টি থাকলে এলিয়টী সাহিত্যের মূল্য বিচার সম্ভব তার উপস্থিতি কডওয়েলের 'Illusion and Reality' নামক পুস্তকে আছে। এবং আমার যতদূর জ্ঞান তাতে কডওয়েলকে সাম্যবাদী বলেই জানি। শক্তি থাকলে ধনতন্ত্রের অনেক গলিত অংশ নিঙড়ে বিপ্লবের ফোঁটা সংগ্রহ করা যে সম্ভব সেটা আমাদের সাম্যবাদী সমালোচক জানেন না, কিংবা মানেন না, কিন্তু এলিয়টের 'decadence' নিঙড়ে অনেক ফোঁটাই আধুনিক ইংরেজ কবিরা কাজে লাগিয়েছেন (এ প্রসঙ্গে Day Lewis-এর 'A Hope for Poetry', Spender-এর 'The Destructive Element', 'The Arts To-day'-তে Macniece-এর প্রবন্ধ পঠিতব্য)।"[১২]

প্রগতিক চেতনার অংশীদার হিসেবে এলিয়ট্-কে গ্রহণ করা বিষয়ে সাম্যবাদী কবি ও সমালোচকদের মধ্যে একটা দ্বিধার ভাব ছিলো তা এই আলোচনাগুলি থেকে বোঝা যায়। বোঝা যায়, সমর সেন কোন্ দিক থেকে এলিয়ট্-কে গ্রহণ করতে চাইছেন। সম্ভবত সেই একই দিক থেকে বিচার করা যাবে তাঁর নিজের কবিতাকেও। আরও লক্ষণীয়, বিষ্ণু দে-র এলিয়ট্-পরিগ্রহণের প্রধান দিকটি হলো নান্দনিক। সমর সেন কিন্তু সাম্যবাদী চেতনার দিক থেকেই গ্রহণ করতে চেয়েছেন এলিয়ট্-কে।

চল্লিশের দশকের এই বাদানুবাদের ফলে একদল কবি এলিয়ট্ সম্পর্কে খানিকটা মোহমুক্ত হয়ে উঠলেন। তবু তারই মধ্যে কারো কারো লেখায়

কিছু কিছু ছাপ ফেলে গেল এলিয়টী রীতি। বিষ্ণু দে-র অনুরাগী কোনো কোনো কবি ছিলেন যাঁরা এলিয়ট্-সচেতন থেকে গেলেন আগাগোড়াই। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত তাঁর প্রবন্ধে জানিয়েছেন যে তাঁর 'স্বর' কবিতাটির কোনো কোনো অংশ এলিয়ট্-এর বাগ্‌ভঙ্গি সামনে রেখে লেখা।—

'ও শব্দ কিসের ?'

'বাতাসের।'

'বাতাসের শব্দ বুঝি এত ভারী হয় !'

'নিশ্চয় !'

'বেঁচে আছো, অথবা তুমিও আজ

বাতাসের মতো মৃত ভারী ?'

(স্বর, স্বর ও অন্যান্য কবিতা)

এলিয়ট্ লিখেছিলেন—

'What is that noise ?'

The wind under the door.

'What is that noise now ?...

'Are you alive, or not ? Is there

nothing in your head ?'

(The Waste Land)

কিরণশঙ্কর তাঁর একাধিক প্রবন্ধে এলিয়ট্-এর কবিতা ও কাব্যভাবনার গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনিও সমর সেনের মতোই মনে করেন, এলিয়ট্ সাম্যবাদী কখনই নন কিন্তু তাঁর কবিতাকে প্রগতিপথের চিহ্ন হিসেবে গ্রহণ করা সম্ভব। —"এলিয়ট্ও তাঁর যুগের সংগ্রামী জনগণের স্বার্থের ধারক নন বটে কিন্তু স্বশ্রেণীর বুর্জোয়া ও মধ্যবিত্ত সমাজের ভাঙন ও ধনতান্ত্রিক সমাজের সংকটকে তিনি বাস্তব সত্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।"[১৩] এলিয়ট্-এর রচনাশৈলী সম্পর্কেও সপ্রশংস মন্তব্য করেছেন তিনি (আধুনিক কবিতার রূপ, সময় ও সাহিত্য, ১৯৫১)।

কবি চিত্ত ঘোষের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অন্তরা'-র 'উপজ্ঞা', 'হিসেব', 'উদয়াস্ত' প্রভৃতি কবিতায় কথ্য-চাল, সংলাপ-ব্যবহার-রীতি কিছুটা দেখা যায়। তিনি মনে করেন এই প্রথম পর্বের কবিতায় বিষ্ণু দে-র প্রভাবের ফলেই এমন ঘটেছিলো। উৎস সন্ধানে এ রীতি এলিয়ট্-এর বলেই মনে হয় যেখান থেকে সম্ভবত নিয়েছিলেন বিষ্ণু দে। অবশ্য চিত্ত ঘোষ অচিরেই প্রভাবমুক্ত হয়ে ওঠেন।

কেউ কেউ মনে করেন সিদ্ধেশ্বর সেন বা রাম বসুর প্রথম পর্বের কোনো কোনো কবিতায় বাক্য সজ্জা, একাধিক স্বরায়ণের বিন্যাস এলিয়ট্‌কে স্মরণ করায়। তবে এগুলি কোনো উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য নয়। মনে হয় চল্লিশের দশকের গোড়ার দিকে বিষ্ণু দে ও সমর সেনের উজ্জ্বল কবিতাবলীর অনুকারকদের রচনায় পরোক্ষভাবে কিছুটা ছড়িয়ে গিয়েছিলো এলিয়ট্‌-এর বাগ্‌ভঙ্গ। সমর সেনের 'নানাকথা' কাব্যগ্রন্থের সমালোচনায় ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন—"এক হিসেবে টি. এস. এলিয়ট-এর Waste Land যে বাঙলা আধুনিক কবিতার জন্মস্থান তার বহু প্রমাণ মেলে। ১৯৪২ সালের সাম্যবাদী পদ্য ও গদ্য-কবিতায় 'ফণিমনসা' প্রতীকটির, রঙের মধ্যে 'হলদে' এবং স্থানের মধ্যে 'বালুচরের' ছড়াছড়ি।" (পরিচয়, ফাল্গুন, ১৩৪৯)।

কথাটিতে সত্যতা ছিলো, তবু মনে হয়, ত্রিশের দশকের এলিয়ট্‌-প্রীতি খানিকটা থমকে দাঁড়ালো চল্লিশের দশকে। ত্রিশের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে শুরু করে চল্লিশে বিস্তৃত হয়েছিলেন যে-কবিরা, এবং চল্লিশের দশকের গোড়ায় যাঁরা শুরু করেন কবিতা লেখা তাঁরা সকলেই এলিয়ট্‌-এর কবিতা ভালোবাসতেন, স্বীকার করতেন তাঁর গুরুত্ব। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে তাঁকে অনুসরণ করবার কথা তাঁরা ভাবেননি। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, চিত্ত ঘোষ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, জগন্নাথ চক্রবর্তী, রাম বসু, সিদ্ধেশ্বর সেন—কেউই ততটা জারিত ছিলেন না এলিয়ট্‌-ভাবনায়। যদিও পরবর্তীকালে জগন্নাথ চক্রবর্তী অনুবাদ করেছেন সম্পূর্ণ 'ওয়েস্ট্‌ ল্যাণ্ড্‌' (চতুষ্কোণ, মাঘ, ১৩৭১)। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কাব্যনাট্য 'প্রথম নায়ক'-এর (১৯৬১) ভূমিকায় বারবার উদ্ধৃত হয়েছে এলিয়ট্‌-এর উক্তি।

চল্লিশের আর একদল কবি ছিলেন ব্যক্তিগত আবেগের প্রবর্তনায় বিশ্বাসী, শিল্পের একান্ত শুদ্ধতায় আস্থাশীল, আশা-আনন্দ-সৌন্দর্যময়তার কিছুটা প্রবক্তা। তাঁদের কাছে সাম্যবাদের প্রবণতা ও ধনতান্ত্রিক সংকটবোধের ছিন্নতা—দুইই ছিলো কবিতায় কিছুটা বর্জনীয়। তাঁরাও বুদ্ধদেব বসুর মতোই ততটা এলিয়ট্‌-এর ভাবে ভাবিত হলেন না। এলিয়ট্‌-এর নৈরাশ্য ও নৈরাত্ম্য—দুইই ছিলো তাঁদের মনোজগৎ থেকে দূরে অবস্থিত। নরেশ গুহ, অরুণকুমার সরকার, অশোকবিজয় রাহা, অরুণ ভট্টাচার্য, শুদ্ধসত্ত্ব বসু ছিলেন এই কবিদের মধ্যে। মোটামুটিভাবে বলা যায় এই সময়

থেকেই এলিয়ট্-এর সৃষ্টিকর্ম প্রত্যক্ষভাবে আর বাঙালি কবিদের সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় অভিঘাত সৃষ্টি করছে না যদিও এমন মনে করেছেন অনেকেই যে, সামগ্রিক বাংলা কবিতার ভাববলয় ও নির্মাণ-শৈলীর বুনোটের মধ্যে অবিচ্ছেদ্যভাবে সাঙ্গীকৃত হয়ে গিয়েছিলেন এলিয়ট্। তাঁর রচনা অনুসরণের চিহ্ন আলাদা করে দেখানো যেমন সম্ভব নয় আর, তেমনিই সম্ভব নয় তাঁকে বিচ্ছিন্ন করাও।

কথাটি জোর দিয়ে বলেছিলেন অমলেন্দু বসু। ১৯৪৮-এ এলিয়ট্ এর ষাট বছর পূর্তি উপলক্ষে একটি মূল্যবান সঙ্কলন-গ্রন্থ প্রকাশিত হয় রিচার্ড মার্চ্ ও তাম্বিমুত্তুর যুগ্ম সম্পাদনায়। ফ্র্যাঙ্ক্ অ্যাণ্ড্ ক্যাস্ (Frank & Cass Co. Ltd) থেকে প্রকাশিত সাতচল্লিশটি কবিতা ও প্রবন্ধের এই সঙ্কলনে বাঙালি লেখক ছিলেন দুজন—বিষ্ণু দে ও অমলেন্দু বসু। বিষ্ণু দের প্রবন্ধটির কথা উল্লেখিত হয়েছে আগে। অমলেন্দু বসুর প্রবন্ধটির নাম ও বিষয়বস্তু ছিলো 'T. S. Eliot and Bengali Poetry' তাঁর মতে বাঙালি কবিরা ঋণী ছিলেন হপ্‌কিন্স্, ফরাসি সিম্বলিস্ট্, পাউণ্ড, ওয়েন্ ইত্যাদির কাছেও কিন্তু সবচেয়ে বেশি ছিলেন এলিয়ট্-এর কাছেই। তাঁর মনে হয়েছে—"Since 1930, the archetypal influence on Bengali Poetry are those of Eliot and Tagore (his later poetry); and it is a nice question as to whose influence cuts deeper. Clearly the time for a full evaluation is not yet"

১৯৪৮-এ যে-বিচার করা সম্ভব ছিলো না, আজ অবশ্য সহজেই তা করতে পারি আমরা। পঞ্চাশের দশকের নবীন কবিরা নির্দিষ্ট বিদেশী প্রভাবের পরিবর্তে নিজেদের দৃষ্টি অনেকটা ফিরিয়ে নিয়েছিলেন নিজেদের মধ্যে। ব্যক্তিগত ও আত্মগত অনুভবের কবিতাই শুদ্ধ কবিতা মনে হয়েছিলো তাঁদের কাছে। এলিয়ট্-প্রভাবের প্রবলতা এই সময়ে কমে গেল সুনিশ্চিত ভাবেই। একদল কবি বহন করলেন চল্লিশের সমাজ-মনস্ক কবিতার ধারা—যে ধারায় এলিয়ট্-এর কবিতার ভাবনা ও প্রকরণ সম্পর্কে একটা সন্দেহ ছিলোই। অন্য দলের কবিরা—যাঁরা মুখ্যত কেন্দ্রিত হয়েছিলেন 'শতভিষা' (১৯৫১) ও কৃত্তিবাস (১৯৫৩) পত্রিকাকে কেন্দ্র করে—তাঁরাও আদর্শ হিসেবে পশ্চিমি কবিতাকে আর প্রাধান্য দিতে রাজি হলেন না। ত্রিশের কবিদের কাছে আধুনিকতার একটি আদর্শ ছিলেন পশ্চিমি কবিদের একটি গোষ্ঠী। পঞ্চাশের কবিরা আদর্শ হিসেবে পেয়ে গেলেন ত্রিশের কবিদেরই।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এলিয়ট্-এর মৃত্যুর পর 'কৃত্তিবাস'-এর বিংশ সংকলনে (১৯৬৫) ছোটো একটি লেখায় বেশ যুক্তিনিষ্ঠ ভাবে এলিয়ট-এর সেই সময়ের স্থানটি বাংলা কবিতার কোথায়--তা নির্দেশে করেছিলেন। —"যখন এদেশে প্রবল আবেগে বিদেশী দ্রব্য বর্জন শুরু হয়েছিল, ঠিক সেই সময়েই বাংলা সাহিত্যে একটি বিলিতি দ্রব্য অত্যন্ত সমাদরে গ্রহণ করা হল। টি. এস, এলিয়টের কবিতা। অতটা আপ্লুত করেছিলেন তিনি, কারণ তিনি এসেছিলেন সমীকরণ হিসেবে—নবীন আমেরিকার প্রতিভূ, ফরাসী সিম্বলিস্ট আন্দোলনের—যা আমাদের কাছে পৌঁছুতেই স্বভাবতই দেরি হয়—ইংরেজি দর্পণ, পাউণ্ডের উন্মাদনা—এই রকম সমন্বয় হিসেবে এলিয়ট এসেছিলেন আমাদের মধ্যে।......

বাংলা কবিতায় তাঁর অধিষ্ঠান প্রায় কুড়ি বছর, রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্তদের প্রধান গুরু। শেষ পর্যন্ত তাঁকে সরিয়ে দিলেন, সম্ভবত তাঁর চেয়েও একজন বড় কবি জীবনানন্দ দাশ। জীবনানন্দ বাংলা কবিতার প্রবাহ থেকে নিঃশব্দে রবীন্দ্রনাথের অপসারণ শুরু করে গেছেন। বাংলা কবিতা আজ সম্পূর্ণভাবে অন্তত এলিয়টের প্রভাবমুক্ত। কিন্তু কবি হিসেবে তিনি থাকবেন বহুদিন।"

মন্তব্যটির সবটাই আমরা মেনে নেবো না হয়তো। কে কার চেয়ে বড কবি এ বিতর্কেরও কোনো শেষ নেই। রবীন্দ্রনাথের অপসারণ বাংলা কবিতা থেকে কতটা শুরু হয়েছে বা হওয়া সম্ভব তারও পরিমাপ করা প্রায় অসম্ভব। আর, বাংলা কবিতার পক্ষে 'সম্পূর্ণ' এলিয়টের প্রভাবমুক্ত হওয়া সম্ভব কিনা সে বিষয়েও থেকে যাবে মতভেদ কারণ অমলেন্দু বসু সে প্রভাবকে বলেছেন 'archetypal influence'। তবে একথাটি বোধহয় আজ নিঃসংশয়েই বলা চলে যে বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের সঙ্গে এলিয়ট্-এর প্রভাবের কোনো তুলনাই হয় না। রবীন্দ্রনাথের অবস্থান বাংলা কবিতার ভিত্তিশিলামূলে আর এলিয়ট্ এসেছিলেন একটি পর্যায়গত পরিবর্তন সাধনের উপযোগী উপকরণ হিসেবে। তাঁদের প্রভাবও থেকে গেছে সেই দুই স্তরেই

অমলেন্দু বসু তাঁর প্রবন্ধটিতে আর একটি জরুরি কথা বলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের কবিতায় মাঝে মাঝে এলিয়ট্-এর বর্ণনরীতির অনুপ্রবেশের যে দিকটি উদাহরণ-যোগে প্রতিষ্ঠা করেছেন শঙ্খ ঘোষ তাঁর 'নির্মাণ আর সৃষ্টি' গ্রন্থে—সেই কথাটিই সংক্ষেপে ১৯৪৮-এই ব্যক্ত করে-

ছিলেন অমলেন্দু বসু—"One has the feeling that the amazing later poetry of Tagore, however inevitably it may have evolved from the earlier, was possible because of the stimulus it received from Eliots poetry.

পঞ্চাশের দশকে বাংলা কবিতার আসরে প্রতিষ্ঠিত হলেন যাঁরা, তাঁরা আর ভাবেননি এলিয়ট্-এর রীতি আলাদাভাবে গ্রহণ করার কথা। বিষয়বস্তুর দিক থেকেও এলিয়ট্-এর কবিতার নতুনত্ব আর ছিলো না। কিন্তু পঞ্চাশের কবিদের ভালো লাগার জগতে বেশ প্রতিষ্ঠিত আসন ছিলো এলিয়ট্-এর। এই কবিদের কেউ কেউ নতুন করে এলিয়ট্ পড়েছিলেন ১৯৪৮-এ তিনি নোবেল পুরস্কার পাবার পর। কেউ কেউ আগ্রহী হয়েছিলেন ১৯৫৩-তে বিষ্ণু দে অনূদিত 'এলিঅটের কবিতা, দেখে। এই পর্বে এলিয়ট্-এর দু একটি বিরূপ সমালোচনাও করা হয়েছিলো (যেমন 'টি, এস, এলিয়ট্ ও নোবেল পুরস্কার', ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, পরিচয়, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৫) তবু কবি এলিয়ট্-এর স্থান ও কৃতি অস্বীকার করবার কোনো প্রশ্নই ওঠেনি কারো মনে। সেই সূত্রেই দেখা যায় ষাটের দশকেও কিছু কিছু এলিয়ট্ অনুবাদ হয়ে চলেছে।

অনিল বিশ্বাস 'পোড়ো জমি' নামে 'ওয়েস্ট্ ল্যাণ্ড-এর অনুবাদ করেছিলেন। গ্রন্থটির প্রকাশ ১৯৭৪-এ হলেও কবির ভূমিকার সঙ্গে প্রদত্ত দিনাঙ্কে দেখা যায় রচনাকাল ১৯৬৩। বইটিতে সংযোজিত হয়েছে বিস্তৃত টীকা, ব্যাখ্যা, উৎস-নির্দেশ কবিজীবনী, নোবেল পুরস্কার কমিটির প্রতিবেদন ও এলিয়ট্-এর প্রতিভাষণ। শঙ্খ ঘোষ 'দ্য ড্রাই স্যাল্ভেজেস্'-এর নিমগ্ন গভীর একটি অনুবাদ করেছিলেন ১৯৬২-তে। 'সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্ত' নামের অনুবাদ-কবিতা-সঙ্কলনে তা ধৃত হয়েছে।[১৪] ঐ সঙ্কলনেই আছে দেবতোষ বসু কৃত 'প্রেলিউড্স্'-এর অনুবাদ 'পূর্বরঙ্গ'। ১৯৬৪-তে জগন্নাথ চক্রবর্তীর 'ওয়েস্ট্ল্যাণ্ড্' অনুবাদের কথা বলা হয়েছে আগেই। ১৯৬৫-তে 'নান্দীমুখ' পত্রিকার দশম সঙ্কলনে (১৩৭২) 'বার্ণট্ নর্টন্' কবিতার অনুবাদ করেছেন আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। ১৯৭১-এ 'ওয়েস্ট ল্যাণ্ড্'-এর পুনর্বার অনুবাদ করেছেন বার্ণিক রায়। ১৯৭৪-এ অম্বিষ্ট পত্রিকার দশম সঙ্কলনে এলিয়ট্-এর কবিতার অনুবাদ করেছেন শিবশম্ভু পাল ও পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল। এলিয়ট্-বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধও ছিলো সঙ্কলনটিতে।

পঞ্চাশের কবিদের কাব্যভাবনায় ও প্রবন্ধেও কখনো কখনো জায়গা

করে নেন এলিয়ট্। যেমন তাঁর কথা বলেছেন শঙ্খ ঘোষ তাঁর 'ঘুমিয়ে পড়া অ্যালবাম' (১৯৮৬) ও 'জার্নাল' (১৯৮৫)-এ। তরুণ সান্যাল তাঁর আধুনিক কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধাবলীতে বারবার নাম করেছেন এলিয়ট্- (আধুনিক কবিতা: বিচ্ছিন্নতা, বিশুদ্ধতা ইত্যাদি প্রসঙ্গ, ১৯৭২)। পঞ্চাশের কোনো কোনো কবি যখন কাব্যনাট্য লিখেছেন—যেমন আলোক সরকার—তখন তাঁদের মনেও কোনো-না-কোনো ভাবে এসেছেন এলিয়ট্—ক্ষীণভাবে হলেও। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতা সম্পর্কিত যে-কোনো গবেষণা-গ্রন্থে এলিয়ট্-এর নাম উচ্চারণ প্রায় আবশ্যিক।

১৯৬৫-তে এলিয়ট্-এর মৃত্যু হলে বিচ্ছিন্নভাবে একাধিক পত্রিকায় তাঁর সম্বন্ধে প্রবন্ধ ও তাঁর কিছু কবিতার অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিলো। এই সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ পি. লাল সম্পাদিত নিবন্ধ-সঙ্কলন 'টি, এস্ এলিয়ট্: হোমেজ্ ফ্রম্ ইন্‌ডিয়া' (রাইটার্স ওয়র্কশপ্)। পঞ্চান্নটি প্রবন্ধ ও শোক-কবিতার এই সঙ্কলনে বেশ কয়েকজন বাঙালি লেখকের রচনা আছে।[১৫] জগন্নাথ চক্রবর্তীর প্রবন্ধে ১৯৬৫-তে এলিয়ট্-সম্পর্কে সাধারণ মনোভাবের একটি রূপরেখা পাওয়া যায়—"Eliot is a major poet of the century but not a 'great' poet... . Eliot is a decisive poet, because he decided and set the tone of whatever was to come after him in poetry." (Thoughts on Eliot)। যদিও দ্বিতীয় দাবিটিও বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে আজ আর আমরা মানতে পারি না। লেখকও বাংলা কবিতার কথা ভেবে সম্ভবত উক্তিটি করেননি।

ষাটের দশকের কবিতায় নয়, কিন্তু কবিদের মনে এলিয়ট্-এর জন্য যে শ্রদ্ধা ও প্রীতির আসন অম্লান ছিলো আজ যেন তাতেও ধুলো জমেছে কিছুটা। তরুণতর কবিদের কাব্যশিক্ষায়, মননে, ভালোবাসায় এলিয়ট্ আজ আর অপরিহার্য নন। তরুণতর এই কবিরা এলিয়ট্-এর সেইটুকুই কিছুটা নিচ্ছেন যেটুকু গঠনের দিক থেকে সাঙ্গীকৃত হয়ে গেছে ত্রিশের কবিদের লেখা থেকেই। সে জন্যই হয়তো এলিয়ট-এর জন্ম শতবর্ষে কিছু আলোচনা-চক্র অনুষ্ঠিত হলেও, কিছু কিছু অনুবাদ ও স্মরণমূলক প্রবন্ধ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও বাংলা লিট্‌ল্ ম্যাগাজিনকে প্লাবিত করতে পারেনি এলিয়ট-ভাবনা। লিট্‌ল ম্যাগাজিন-এর এলিয়ট-সংখ্যা দু' তিনটির বেশি প্রকাশিত হয়নি। তবু এলিয়ট সর্বদেশীয় কবিতার পাঠক ও আলোচকদের

চিরকালই আকৃষ্ট করবেন। যেমন করে থাকেন সব বড় কবি। আধুনিক বাংলা কবিতার বিবর্তন ও ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে এলিয়ট্-এর নাম —একথাও শ্রদ্ধার সঙ্গে আমরা মনে রাখবো চিরকাল ॥

উল্লেখসূত্র

১। R. F. 'Rattray', Poets in the Flesh : Tagore, Yeats, Dunsany, Stephens, Drinkwater' (Cambridge 1961)—এই উদ্ধৃতি ও উল্লেখ গৃহীত হয়েছে বিকাশ চক্রবর্তী'র লেখা 'রবীন্দ্রনাথের এলিয়ট' প্রবন্ধ থেকে। 'প্রতিক্ষণ', সংস্কৃতি সংখ্যা, ১৩৯৫

২। বিষ্ণু দে-র পত্রাবলী ও সেই সূত্রে রচিত পাদটীকা পাওয়া যাবে 'দেশ', সাহিত্যসংখ্যা, ১৩৮২-তে।

৩,৪। 'কি করে লেখক হলুম', বিষ্ণু দে, 'অমৃত', জুলাই, ১৯৬৯

৫। 'এই মৈত্রী! এই মনান্তর!' অরুণ সেন, আশা প্রকাশনী, ১৯৭৭, পৃ: ৪৫

৬। 'Sudhindranath Dutta', Amiya Dev, Sahitya Akademi, 1982, P, 117

৭। ১৯৬৬-তে 'দৈনিক কবিতা'-র কোনো সংখ্যায় শোভন সোমকে দেওয়া সাক্ষাৎকার। 'ইতিবাচক', জুলাই, ১৯৮৮-তে পুনর্মুদ্রিত।

৮। 'অন্বিষ্ট', দশম সঙ্কলন, ১৯৭৪-এ প্রকাশিত প্রশান্ত দাঁ-কে প্রদত্ত সাক্ষাৎকার।

৯। এই তালিকা প্রণয়নে অরুণ সেন সঙ্কলিত 'বিষ্ণু দে-র রচনাপঞ্জি'-র সাহায্য নেওয়া হয়েছে। অয়ন, ১৯৮০

১০। 'A Challenging Decade', Lila Ray, D. M. Library, 1953, P, 66

১১। 'পরিচয়-এর কুড়ি বছর ও অন্যান্য স্মৃতিচিত্র', হিরণকুমার সান্যাল, প্যাপিরাস, ১৯৭৮, পৃ, ৬৬

১২। প্রদ্যোৎ গুহ, স্বদেশ বসু, সরোজ দত্ত ও সমর সেনের প্রবন্ধ চারটির উদ্ধৃতি ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত 'মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক' (তিন খণ্ড ১৯৭৫, ১৯৭৬, ১৯৭৮) থেকে গৃহীত। প্রাইমা পাবলিকেশন্স্।

১৩। 'এলিয়ট প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ', কবিতার রূপরূপান্তর, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, উচ্চারণ, ১৯৮১,

১৪। 'সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্ত', শঙ্খ ঘোষ ও অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত সম্পাদিত। নতুন সাহিত্য ভবন, ১৯৬২

১৬। পি. লাল সম্পাদিত গ্রন্থটির শেষে একটি তালিকায় বলা হয়েছে যে ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের কোনো রবিবার স্টেট্‌স্‌ম্যান্‌-এ বুদ্ধদেব বসুর এলিয়ট্‌ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। কিন্তু ১৯৫৯-এর প্রতিটি রবিবারের কাগজ ও ক্রোড়পত্র দেখেছি, প্রবন্ধ পাইনি। কেউ কেউ বলেছেন—রবিবার নয়, সপ্তাহের অন্য কোনোদিন তৃতীয় সম্পাদকীয়-তে বুদ্ধদেব বসুর এলিয়ট্‌ সম্পর্কে লেখা বেরিয়েছিলো। কিন্তু অনামাঙ্কিত সেই ছোটো লেখা বুদ্ধদেব বসুর বলে প্রমাণ করা দুরূহ। তথ্যটি অনেকে অস্বীকারও করেছেন।

এলিয়ট-এর বাক্যনির্মাণ পদ্ধতিঃ বাংলা কাব্যে তার প্রতিফলন

উদয় কুমার চক্রবর্তী

As we get older we do not get any younger.
Seasons return, and to day I am fifty-five,
And this time last year I was fifty-four,
And this time next year I shall be sixty-two.
And I connot say I should like
(to speak for myself)
To see my time over again—if you can call it time
Fidgeting uneasily under the draughty stair,
Or counting sleepless nights in the
crowded tube.[১]

এই সার্থক বিদ্রূপ কবিতাংশটির দিকে তাকালে, আমরা সহজেই বুঝে যাবো এলিয়টের বাক্য নির্মাণের প্রধান প্রধান কৌশলগুলি। আমরা এখানে যে বিষয় নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি—তা দীর্ঘ গবেষণা সাপেক্ষ। বিশেষত, বাংলা কবিতায় এলিয়ট-এর বাক্যনির্মাণ কৌশল যেভাবে কখনো উদ্ভাসিত, কখনো বা আত্ম-গোপন করে আছে—তা নির্ণয় করা, পরিপূর্ণভাবে তার পরিচয় তুলে ধরা এই প্রবন্ধে আয়াসসাধ্য। মনে রাখতে হবে, কেবলমাত্র এলিয়ট-এর কবিতা নিয়েই যদি আমরা সংগঠনবিজ্ঞানের (Structuralism) দৃষ্টিতে আলোচনা করতে চাই, তাহলেও তা সময়সাপেক্ষ সূক্ষ্ম গবেষণার অপেক্ষা রাখে। সুতরাং ডঃ পবিত্র সরকার ব্যবহৃত[২] মাইক্রো-স্টাইলিস্টিক্স এবং ম্যাক্রোস্টাইলিস্টিক্স-এর মধ্যে আমরা আমাদের আলোচনা ম্যাক্রোস্টাইলিস্টিক্স-পদ্ধতির ক্ষেত্রে আবদ্ধ রাখব। এই পদ্ধতি অবলম্বনের

ফলে, এলিয়ট-এর প্রতি কবিতার বাক্যের প্রতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং বাংলা কাব্যের, প্রতি কবির, প্রতি কবিতায় সেই ধরনের বাক্যগঠনের অসামঞ্জস্য কিম্বা সুসামঞ্জস্য অথবা ঋণ নিয়ে আলোচনার প্রত্যাশা এই প্রবন্ধের পাঠক অবশ্যই রাখবেন না।

রবীন্দ্রনাথ গদ্য কবিতা লিখতে গিয়ে যে এলিয়ট-এর কবিতার কাছে বারবারই পৌঁছে যাচ্ছেন, সেকথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন বুদ্ধদেব বসু[৩]। এলিয়ট-এর কবিতা অনুবাদ করতেও দেখা যাচ্ছে তাঁকে[৪]। কিন্তু অনুবাদ নয়—কবিতার ভাষায় এলিয়ট যে ভাস্কর্য নির্মাণ করেছেন তারই সচেতন কিম্বা অসচেতন প্রভাব বাংলা কবিতার ভাষায় কীভাবে এসে যাচ্ছে তা লক্ষ্য করা বিশেষ প্রয়োজনীয়।

আবার একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক রীড-এর ব্যঙ্গ কবিতাটির দিকে। এলিয়ট-এর বিখ্যাত কিছু বাক্য-র ঝলক চোখে পড়বে। চোখে পড়বে প্রতিমা (imagery)[৫] ব্যবহার। বিশেষ শব্দ-কে নানা ব্যঞ্জনায় প্রকাশ—এক মায়াময় বাক্স্পন্দ-পুনরাবৃত্ত বাক্যখণ্ড (Phrase) ইত্যাদি। আমাদের অনুসন্ধান, এলিয়ট-এর এই জাতীয় কিছু ব্যবহার এর অন্তর্নিহিত কৌশল-এর উপস্থাপন।

মুকারোভস্কি খুব সঙ্গত প্রশ্নই তুলেছেন আমাদের কাছে[৬]। কোন নির্দিষ্ট নর্ম-এর কাছে কবি কি আবদ্ধ? না-কি তিনি নিজে তৈরি করে নেন কোন নর্ম! কবিতার সঙ্গে গদ্য-র পার্থক্য যতখানি, গদ্য কবিতার সঙ্গে গদ্য-র পার্থক্য কি ঠিক ততটাই? বাংলা কবিতা প্রসঙ্গে বলা যায় 'কাব্যিক ভাষা' বলে যে ভাষার পরিচয় আমরা পেয়েছিলাম যেমন, নয়ান, বারতা, আধো, মৃদুল, মম, মোর, রচা, নিবারা, পানে, তরে ইত্যাদি ইত্যাদি তা বর্তমান কবিতায় কেউ ব্যবহার করতে চাইবেন না অবশ্যই। মুকারোভস্কি বলতে চান কবিতার ভাষা পাঠককে তার নিজের দিকে আগে টানবে কিন্তু এ মত সম্পূর্ণ মানা যায় না[৭]। এলিয়ট কোন বিশেষ নর্ম-থেকে সরে যাচ্ছেন একথা বলার থেকে এলিয়ট-এর কবিতা রচিত হবার একটি বিশেষ নর্ম তৈরি করে ফেলেছে সে কথা বলাই অধিক সঙ্গত। উদাহরণ হিসাবে এখানে আমরা তাঁর কবিতার কয়েকটি দিক লক্ষ্য করব। অবশ্য এক্ষেত্রে মুকারোভস্কি-র বিচ্যুতিবাদ (deviation theory), হ্যালিডে ও লীচ-এর ভাষার সংগতি ও প্যাটার্নের পুনরাবৃত্তি বা সমন্বয়বাদ এবং চমস্কি-রস-লেকভ-এর সংবর্তনী-সঞ্জননী তত্ত্ব এই তিন পন্থার[৮] কোন বিশেষ

একটিকে আমরা গ্রহণ করব না। স্বনবিজ্ঞান (Phonetics), রূপ-স্বনবিজ্ঞান (morpho-phonemic)-এর ধারণা অনুযায়ী ধ্বনির খণ্ড (Segment) এবং অধিখণ্ড (Suprasegment) গত আলোচনা কবিতার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজনীয় ভূমিকা গ্রহণ করে। কিন্তু আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়: বাক্যের অন্বয় গত বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরা।

এলিয়ট-এর কবিতায় সবচেয়ে আগে চোখে পড়ে পুনরুক্তিমূলক বাক্য-খণ্ড। যেমন একই পংক্তি পরপর তিনবার ব্যবহার করছেন তিনি—

১. This is the way the world ends

This is the way the world ends

This is the way the wor'd ends[৯]

কিম্বা একই পংক্তিতে তিনি পুনরুক্তিমূলক বাক্য ও খণ্ড পরপর ব্যবহার করেছেন।

২. I grow old ... I grow old ...[১০]

এর পাশাপাশি আরেক ধরনের পুনরুক্তি দেখা যাবে, যাকে আমরা ধ্রুবাপদ (refrain) হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি। এই জাতীয় এক বা একাধিক পংক্তি তিনি একাধিকবার ব্যবহার করেছেন দেখা যাবে। যেমন সঙ্গীতের মতো—

৩. Weialala leia

Wallala leialala

এই পংক্তিদ্বয় তিনি দুবার ব্যবহার করেছেন[১১]। এর পাশাপাশি মনে পড়বে শাণিত পংক্তিদ্বয়, যা দু'বার ফিরে এসেছে ধ্রুবাপদের মতো।[১২]

৪. In the room the women come and go

Talking of Michelangelo.

কেবল এলিয়ট-ই নন, এই সময়ে আরো অনেক কবি একই পংক্তি একাধিকবার ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে সম্ভবত কোন বিশেষ বক্তব্য উপস্থাপনের পাশাপাশি চাইছিলেন মিউজিক্যাল কোন প্যাটার্ণ সৃষ্টি করতে। কিন্তু, তাঁদের থেকে এলিয়ট-কে আমরা আলাদা করে নিতে পারি অনায়াসেই। কিন্তু সে আরেক প্রসঙ্গ। আমরা এলিয়ট-এর বাক্য-খণ্ডগুলির দিকে তাকালে লক্ষ্য করব কেবল পুনরুক্তি নয় কেবল সমান্তরাল বাক্যখণ্ড সৃজন-ই নয়, তার পাশাপাশি কবিতার ভাষায় তিনি চাইছিলেন এমন কিছু প্যাটার্ণ নিয়ে আসতে যা বিশেষভাবে তাঁর নিজের।

'প্যারডি'-র মধ্য দিয়ে রীড এলিয়ট-এর সেই স্বকীয় বাক্য নির্মাণ পদ্ধতির দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করান।

৫. ক Unreal city
Under the brown fog of a winter dawn[১৩]

খ. Unreal city
Under the brown fog of a winter noon[১৪]

পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়ে সময় সূচক শব্দটি বদলে দেন তিনি, বুঝিয়ে দেন একই গতানুগতিকতার মধ্য দিয়ে সময় এগিয়ে যাচ্ছে। বক্তব্য-র ক্ষেত্রে সময়জ্ঞাপক শব্দ যেমন জরুরি তেমনি এই পুনরাবৃত্ত বাচন এলিয়ট এর একটি বিশেষ প্রকাশ ভঙ্গি আমাদের কাছে তুলে ধরে। যেমন,

৬. Because I do not hope to turn again
Because I do not hope
Because I do not hope to turn[১৫]

১৯৩০ সালে প্রকাশিত এই কবিতায় তিনি বিলোপন (Deletion) করছেন কখনো একটি বাক্যখণ্ড কখনো বা এক/একাধিক শব্দ। কিন্তু প্রথম দুটি পাতা জুড়ে দেখা যাবে, কীভাবে তিনি এই মূল বাচনটিকে নানাভাবে সংযোজিত—বিলোপিত প্রভৃতি নানা সংবর্তনের (Transformation) মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে উপস্থাপিত করেছেন। যেমন, ১৫

৭ ক. Because I do not hope to know again

খ. Because I do not think
Because I know I shall not know

গ. Because I cannot drink

ঘ. Because I know that time is always time

ঙ. Because I cannot hope to turn again

চ Because I do not hope to turn again

ছ. Because these wings are no longer wings to fly.

হতে পারে এলিয়ট 'Because' জাতীয় শব্দকে বারবার ব্যবহার করতে চাইছেন নিজেকে একটি বিশেষ আত্মবিশ্লেষণ-এর প্রেক্ষিতে স্থাপন করতে। আসলে এলিয়ট তৈরি করে ফেলেছেন কিছু সমান্তরাল বাক্যখণ্ড। সমান্তরলতা (Parallelism) এলিয়ট-এর কবিতায় নানাভাবে এসেছে। যেমন পুনরাবৃত্ত বাক্যবন্ধ হিসাবে,১৬

৮. ক. So, how should I presume ?

খ. And how should I presume ?

গ. And should I then presume ?

And how should I begin ?

মনে রাখতে হবে, বাক্যগুলি প্রশ্নবাক্য (Question Sentence) ধ্রুবা-পদের মতোই এই প্রশ্নবাক্য তিনি তুলে ধরেছেন।

৯. What shall I do now ? What shall I do ? ১৭

সমান্তরাল বাক্যবন্ধ-র ক্ষেত্রে তিনি নানা ধরনের বিন্যাস করেছেন, নানাভাবে, তার অজস্র উদাহরণ থেকে দু-চারটি বিশেষ ধরন এখানে পরপর লক্ষ্য করা যাক।

১০. Shape without form
Shade without colour ১৮

১১. You tossed a blanket from the bed
You lay upon your back, and waited,
You dozed and watched the night revealing. ১৯

১২. We are the hallow men
We are the stuffed men

... ...

As the hollow men
The stuffed men ২০

১৩. This is the dead land
This is the cactus land.২১

১৪. The yellow fog that rubs its back upon the—
—the window panes,
The yellow smoke that rules its muzzle on the
—window panes.২২

১৫. For the yellow smoke that slides along the street
Rubling its back upon the window panes.২৩

১৬. April is the cruellest mouth, breeding
Lilacs out of the dead loud, mixing
Memory and desire, stirring

Dull roots with spring rain.

Winter kept us warm, covering

Earth in forgetful snow, feeding

A little life with dried tubers.২৪

১৭. HURRY UP PLEASE IT'S TIME

HURRY UP PLEASE IT'S TIME২৫

১৮. Goonight Bill.

Goonight Lou.

Goonight May.

Goonight. Ta ta.

Goonight.

Goonight.

Good night, ladies

Good night, sweet ladies,

Good night

Good night.২৬

১৯. Here is Belladonna, the lady of the Rocks,

The lady of situations.

Here is the man with three staves, and here the wheel,

And here is the one-eyed merchant.২৭

এলিয়ট্-এর কাব্যানুসন্ধান করলে এ জাতীয় উদাহরণ প্রায় সর্বত্রই চোখে পড়বে। কিন্তু এই বাক্যবন্ধগুলি থেকে আমরা কি প্রমাণ করতে চাইছি? এলিয়ট্ কোন বিশেষ প্যাটার্নের দিকে চলেছেন, তার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই চোখে পড়েছে। এই বৈশিষ্ট্যের স্তরগুলি বিশ্লেষণ করার আগে আবার একগুচ্ছ উদাহরণ পাঠকের কাছে উপস্থাপিত করতে চাই, যাতে আমাদের সিদ্ধান্ত বিশেষ একটি ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হতে পারে।

২০. But though I have wept and pasted, wept and prayed,

Though I have seen my head [grown slightly bald] ২৮

২১. In a life composed so much, so much of odds

—and ends.২৯

২২. To Prepare a face to meet the faces that
—you meet.৭০

২৩. Who walked between the violet and the violet
Who walked between.৭১

২৪. Here is no water but only rock
Rock and no water...........
............It there were water
And no rock
It there were rock
And also water
And water.৭২

২৫. Between the idea
And the reality
Between the motion
And the act
Falls the shadow
For Thine is the kingdom
Between the conception
And the creation
Between the emotion
And the response
Falls the shadow
Life is very long
Between the desire
And the spasm
Between the potency
And the existence
Between the essence
And the descent
Falls the Shadow
For Thine is the kingdom

For Thine is

Life is

For Thine is the ৩৩

২৬. For I have known them all already, known them all—

Have known the evenings, mornings, afternoons,......

.................So how should I presume

And I have known the eyes already, known them all—

The eyes that fix you formulated phrare, ...

... ...

And how should I preseme ?৩৪

২৭. And indeed there will be time

For the yellow smoke that slides along the street

... ...

There will be time there will be time

To prepare a face to meet the faces that you meet ;

There will be time to murder and create,

And time for all the works and the days of hands.

... ...

Time for you and time for me....

And time yet for a hundred, indecisious,

... ...

And indeed there will be time

... ...

Time to turn back and descend the stair.৩৫

এই উদাহরণটি শেষ করার পর আবার আমরা রীড-এর বিদ্রূপ কবিতার দিকে ফিরে তাকাতে পারি। সেখানে 'Time' শব্দটির ব্যবহার, বাক্যবন্ধগুলির সমান্তরাল ব্যবহার আমাদের এখন সার্থক মনে হবে।

এলিয়ট যেভাবে ধ্রুবাপদের ব্যবহার করেছেন, যেভাবে বাক্যবন্ধগুলির পুনরাবৃত্তি—সমান্তরাল ভাবে স্থাপন ইত্যাদি করেছেন, তা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় তিনি মিউজিক্যাল প্যাটার্নের কথা ভাবছেন। শুধু বক্তব্য নয়—শব্দ ব্যবহার নয় গঠনের মধ্য দিয়ে একটি বিশেষত্ব স্থাপন করতে

চাইছেন। কারণ, আমরা জানি, কবিতায় ব্যবহৃত শব্দ আমাদের কথার ভাষায়—গদ্য ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ-র মতই—পার্থক্য শব্দগত নয়—পার্থক্য ফর্ম-এর।৩৬

এলিয়ট-এর কাব্যে চোখে পড়বে, একটি বিশেষ বক্তব্যগত যুক্তির উপর একটি সিদ্ধান্ত বা একাধিক সিদ্ধান্ত 'Tautologus' হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।৩৭ আমাদের ব্যবহৃত উদাহরণগুলিতে তার নিদর্শন পাওয়া যাবে Ash Wednesday-র থেকে উদ্ধৃত 'Because' দিয়ে আরম্ভ পংক্তিগুলিতে। একাধিক কারণ সমান্তরালভাবে তিনি তুলে ধরেছেন। নানাভাবে, এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য তাঁর লেখায় ফুটে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ-এর একটি কবিতায় এর সুন্দর ব্যবহার চোখে পড়বে,

......"সংশয়ে তাকে আমরা অস্বীকার করেছি

ক্রোধে তাকে আমরা হনন করেছি,

প্রেমে এখন আমরা তাকে গ্রহণ করব,

কেননা, মৃত্যুর দ্বারা সে আমাদের সকলের জীবনের মধ্যে সঞ্জীবিত,

সেই মহামৃত্যুঞ্জয়।"৩৮

আপাত সূক্ষ্ম Tautology চোখে পডবে রবীন্দ্রনাথ-এর গদ্যকবিতায়—

তার ধন নয় উদ্ধত, তার দৈন্য নয় মলিন

এ দুইয়েই তার শোভা ৩৯

'শুচি' কবিতায় লজিক্যাল বাক্যবন্ধ চোখে পড়বে, নঞর্থক ভঙ্গিতে,

তাই তোমাকে দেখতে পাইনি এতকাল,

তাই তোমাকেই আমার প্রয়োজন,

নইলে হবে না মৃতের সৎকার।৪০

কেবল Tautology-ই নয়, পাশাপাশি চোখে পড়বে এইসব বাক্যবন্ধগুলি সমান্তরাল। এই ধরনের Tautologous সমান্তরাল বাক্যবন্ধ রবীন্দ্রনাথ-এর পুনশ্চ কাব্য থেকে বিশেষভাবে আমাদের চোখে পড়ে।

বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় কখনো এই ধরনের বাক্যবন্ধ চোখে পড়তে পারে,

সব আমি জানি, তবু—তাই ভালোবাসি,

জানি ব'লে-আরো বেশি ভালোবাসি।

জানি, শুধু ততদিন তুমি র'বে তুমি

যতদিন র'বে মোর প্রিয়া ৪১

এ-ও নঞর্থক যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। পাশাপাশি সমান্তরাল বাক্যখণ্ড (Phrase)-ও চোখে পড়বে। এই নঞর্থক ভঙ্গি আরো কবিতায় চোখে পড়বে, যেমন,

এমন দিনে তারে বলা যায়
আজকের মতো এই বর্ষার দিনে।
কিন্তু বলার কিছু নেই যে।৪২

এলিয়ট্-এ এমন নঞর্থক ভঙ্গি অনেক ব্যবহার করেছেন, যেমন,

২৮. Drip drop drip drop drip drop drop
But there is no water ৪৩

সঞ্জয় ভট্টাচার্য-র কবিতায় সদর্থক বাক্যবন্ধ চোখে পড়বে.

সূর্য আছে, দেহতটে আছে তাই নূতন জোয়ার ৪৪

সমান্তরাল বাক্যখণ্ডও তিনি নিয়ে এসেছেন এই কবিতায় ;

সূর্য আছে
আছে
মাটি
ফিরে আসে
আকাশ ও
চাঁদ
....
সূর্য থাকে কালো কালো ত্বকের আড়ালে ৪৫

চকিতে চোখে পড়তে পারে সুভাষ মুখোপাধ্যায়-এর এই পংক্তি

সংসারে ডুবেছি, তাই জ্বালাই না ধুনি। ৪৬

মজার Tautologous পংক্তি চোখে পড়বে তার কবিতায়, যেমন, এস্-ডি-ওর জামাই রেডিও বাজাতে গিয়ে গলদঘর্ম হয়ে যে শব্দ শোনায় রেডিও থেকে তা, কুকুর-বেড়াল-এর ডাক, তারপর-ই অপূর্ব লজিক—

আরেকজন বলল, ঐ জামাতাটি ভুষি।
শেষের দলটি বলল, এ থেকেই বোঝা যায়
রেডিও ব্যাপারটাই ভুয়ো।৪৭

● বিষ্ণু দে-র কবিতায় চোখে পড়বে অন্য এক ধরনের যুক্তিবদ্ধ বাক্য,

পরন্তু মানুষ তো, তাই জীবনেই দায়িত্ব অর্সায়—
আসন্ন শরতে, বা নবান্নে, আপাতত গ্লানির বর্ষায় ॥৪৮

জীবনানন্দর কবিতায় অনুসন্ধান যদি করি, তাহলে নিশ্চয়ই চোখে পড়বে এই জাতীয় ব্যবহার,

তুমি আছ বলে আমি কেবলই দূরে চলতে ভালোবাসি ৪৯

যুক্তিবদ্ধ বাক্য-ই শুধু নয়, পাশাপাশি সমান্তরাল বাক্যবন্ধ প্রয়োগ-ও চোখে পড়বে,

ধানসিড়ি নদীর কিনারে আমি শুয়েছিলাম—পউষের রাতে—
কোনদিন আর জাগব না জেনে
কোনদিন জাগব না আমি—কোনোদিন জাগব না আর—৫০

Tautologous বাক্যবন্ধ বাংলা কবিতায় অজস্র চোখে পড়বে—তার মানে এই নয় যে, এলিয়ট্ দ্বারা সকলেই প্রভাবিত হয়েছেন। আমাদের পাশাপাশি এই জাতীয় উদাহরণ তুলে ধরার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, এলিয়ট্-এর কাব্যে যে মাত্রায় এর ব্যবহার, কেউ কেউ সেই মাত্রায় পৌঁছে যেতে চাইছেন, তা লক্ষ্য করা।

B. N. Chaturvedi আমাদের জানান যে, Miss Bradbrook তাঁর 'Eliot's Critical Method' গ্রন্থে এলিয়ট্-এর গদ্য রচনায় নঞর্থক ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছেন,

'It is expository rather than forensic, and works much
in terms of negatives, and of definition by exclusion.'৫১

যে কথা Badbrook এবং Chaturvedi এলিয়ট্-এর গদ্য সম্বন্ধে বলেছেন, তা তাঁর কবিতার ক্ষেত্রে আরও বেশি প্রাধান্য পেয়েছে একথা বলা বাহুল্য। এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত (৬, ৭ ক-ছ, ১০, ২৪, ২৮ সংখ্যক) উদাহরণগুলি লক্ষ্য করলেই এ কথার যৌক্তিকতা বোঝা যাবে। এছাড়াও, আরও বিশেষ কিছু ব্যবহার আমরা এখানে তুলে ধরবো, যেমন,

২৯ That is not what . meant at all ৫২

বাক্য বিগর্ভণ (Embedding) চোখে পড়বে এই জাতীয় ব্যবহারে। কিম্বা বাচ্যসংবর্তন (Passivization)-এর উদাহরণ,

৩০. Nor was meant to be ৫৩

প্রশ্নবাক্য নঞর্থক বাক্য মিলিত বিশেষ আবেগময় এক বাক্যবন্ধ,

৩১. Oh, do not ask, 'what is it ?৫৪

অথবা পাশাপাশি নঞর্থক বাক্য-বিপ্রক্রম সূত্র (Flip Flop Rule) দ্বারা ব্যবহার করে দেখিয়েছেন বাক্য উৎপত্তির গভীরের কথা,

৩২. The eyes are not here
There are no eyes here.৫৫

Chomsky সংবর্তনী-সঞ্জননী তত্ত্ব (Transformational Generative theory) প্রচারের বহু আগেই এলিয়ট্‌ ঐতিহাসিক ব্যাকরণের সূত্র ধরে ভেবেছিলেন একই শব্দ নানা অর্থে ব্যবহার করা যায়, তার প্রমাণ তাঁর কবিতায়। [৩২] সংখ্যক উদাহরণটি লক্ষ করলে বোঝা যাবে, দুটি বাক্য-র অধোগঠন (Deep Structure) এক নয়। দুটি বাক্য অর্থগত দিক দিয়েও পৃথক। এ প্রসঙ্গে মনে পড়বে, রবীন্দ্রনাথ কীভাবে একই শব্দ ব্যুৎপত্তিগত অর্থে এবং পরিবর্তিত অর্থে নানা স্থানে ব্যবহার করেছেন। যেমন, ৫৬

'ক্রীড়াশৈলে আপন মনে/দিতাম কণ্ঠছাড়ি' [কণিকা]

cf

'গুণদার বাগানের ক্রীড়াশৈল হইতে পাথরচুরি' প্রথম উদাহরণ-এ 'ক্রীড়াশৈল' অর্থ 'বিহারশৈল', দ্বিতীয় উদাহরণ-এ 'খেলাপাহাড়' অর্থ প্রযুক্ত হয়েছে।

নঞর্থক ব্যবহার-এ ক্ষেত্রে বাংলা কবিতাকারগণও নানা প্যাটার্ন তুলে ধরেছেন। যেমন রবীন্দ্রনাথের কবিতায়,

কোথাও রইল না তার ক্ষত,
কোথাও বাজল না তার ক্ষতি ৫৭

সমান্তরাল নঞর্থক বাক্য ব্যবহার। সমান্তরাল বাক্যবন্ধ দ্বারা কখনো কখনো তিনি স্বাভাবিকভাবে প্রতিকূলতা নঞর্থক বাক্য দ্বারা প্রকাশ করছেন,

কখনো ছাগলে দেয় মুড়িয়ে
কখনো মাড়িয়ে দেয়, গোরুতে
তবু মরতে চায়না,··· ৫৮

বাক্যখণ্ড পুনরুক্তি মূলক, বারংবার নঞর্থক শব্দ প্রয়োগ না করে একটি-মাত্র নঞর্থক শব্দ ব্যবহার করে এই নেতিমূলক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন রবীন্দ্রনাথ,

কত লোক কত বললে, কত নিলে, ফিরিয়ে দিলে,
ভোগ করলে দাম দিলে না, সেও কত লোক,—৫৯

বারংবার 'কত' শব্দ-র প্রয়োগ—একদিকে যেমন প্রাচুর্য অন্যদিকে অপ্রাপ্তির ও ধারাবাহিকতার ইঙ্গিতময় ভাষা হয়ে উঠেছে তার ভাষা। বেছে নেবার প্রশ্নও নঞর্থক বাক্যের মধ্যে তিনি করেছেন,

যে গন্ধ চুলের, না শুকনো ফুলের,

না শূণ্য ঘরে সঞ্চিত বিজড়িত স্মৃতির,

বিছানায়, চৌকিতে পর্দায়।৬০

সমান্তরাল বাক্যবন্ধ একটি উৎকণ্ঠিত অপেক্ষা এবং নঞর্থক বাক্য দ্বারা তার অপ্রাপ্তির নৈরাশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে,৬১

ক. দিনের পর দিন গেল, রাতের পর রাত

Cf : ... ...

খ. দিনের পর দিন আসে, রাতের পর রাত

তুমি আস না

আবার বারংবার নঞর্থক ব্যবহার করে কোনো চেতনায় এলিয়ট-এর মতো ধাক্কা মারতে চান তিনি,

ক. ওর নাম নেই, সংজ্ঞা নেই, বেদনা নেই

কিছুতে নেই কোনো দরকার,৬২

খ. কোনোখানেই নেই

আমি একজন লোক৬৩

বুদ্ধদেব বসুর কবিতায়,৬৪

ক. না হয় ডুবিয়া আছি কৃমি ঘন পঙ্কের সাগরে,

খ. না হয় রেখেছো বেঁধে' তবু জেনো শৃঙ্খলিত ক্ষুদ্র হস্ত মোর

সমান্তরাল বাক্যবন্ধ এখানেও বারবার ব্যবহৃত হয়েছে, তা লক্ষ করা যাবে। সুধীন্দ্রনাথ দত্তর কবিতাতেও একই সাথে সমান্তরাল বাক্যবন্ধ এবং নঞর্থকতা ফুটে উঠেছে দেখা যাবে,

দেখবি না কি

দেখবি না কি চারপাশে তোর আবহমান প্রাণ ৬৫

সুভাষ মুখোপাধ্যায়-এর কবিতাতেও পুনরাবৃত্তি এলিয়ট্-এর বাক্যবন্ধ স্মরণ করাবে,

ক. খোলা হাওয়া কোথাও

নেই কোথাও

নেই ৬৬

খ. বারবার ফিরে আসা নয়।

পারাপার

নয়।

শুধু যাওয়া।৬৭

দ্বিতীয় উদাহরণ, এ নেতি থেকে ইতিবাচকতার দিকে চলে আসছেন।

জীবনানন্দ দাশ নঞর্থক বাক্য ব্যবহার করে কবিতার ভাষাকে বিশেষ তাৎপর্যে আন্দোলিত করেছেন ৬৮। এখানে দু'-একটি উদাহরণ মাত্র লক্ষ্য করব,

ক সে আগুন জ্বলে যায় দহেনাকো কিছু
সে আগুন জ্বলে যায়
সে আগুন জ্বলে যায়
সে আগুন জ্বলে যায় দহেনাকো কিছু ৬৯

খ. শক্তি আছে শান্তি নেই
প্রতিভা রয়েছে তার ব্যবহার নেই
প্রেম নেই ৭০

সমান্তরাল বাক্যখণ্ড-র মধ্য দিয়ে শক্তির অপচয় এবং তার অ-ব্যবহারকে তুলে ধরেছেন সুন্দরভাবে। এলিয়ট্-এর বাক্যবন্ধ এ প্রসঙ্গে সহজেই মিলিয়ে দেখা যেতে পারে।

রাম বসু-র কবিতায় এই ধরনের প্যারালাল পংক্তি সুন্দরভাবে বিন্যস্ত। যেমন,

ক আমরা হেরে যাবো না
আমরা মরে যাবো না
আমরা ভেসে যাবো না ৭১

খ. অপচয় অনেক হয়েছে
আর নয়, থামো
দৃষ্টিহীন, দ্রষ্টা হয়ো না ৭২

'অপচয়' এবং 'দৃষ্টিহীন' শব্দ দুটির অর্থও নেতিবাচক। 'যার শেষ নেই' কবিতায় রাম বসু যে কটি পংক্তি ধ্রুবাপদ-এর মতো ব্যবহার করেছেন, তার মধ্যে নঞর্থক বাক্য ব্যবহার চোখে পড়বে, ৭৩

বিস্ময় এখন / স্পর্ধায়। না। যদি বলে
কেউ বুক টান করে

বিষ্ণু দে-র কবিতাতেও এই জাতীয় নঞর্থক ধ্রুবাপদ চোখে পড়বে,

সেই থরো থরো দিনের সে স্মৃতি
স্মরণে কি আর কথা নাহি কয়?৭৪

এলিয়ট্-এর কবিতায় প্রসঙ্গ বদল (change of points) এবং

রেজিস্টার-এর বদল (shift of register) বিশেষভাবে চোখে পড়বে।৭৫ রেজিস্টার৭৬ নানা মাত্রায় তিনি ব্যবহার করেছেন ক্লাসিক্যাল বন্দনা ধরনের, পুরাণ প্রসঙ্গ, ইতিহাস-চেতনা, লোককথা, মিথ প্রভৃতি বিষয় দ্বারা প্রভাবিত ভাষারূপ চোখে পড়বে। সে বিস্তারিত বর্ণনায় না গিয়ে সহজেই রেজিস্টার বদল-এর উদাহরণ এখানে দেওয়া যেতে পারে। The Waste Land কবিতাটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, কখনো Marie Larich-এর My Past-এর কাহিনীকে ভাষা বদলিয়ে কিম্বা বাক্য-র কর্ম বদলিয়ে ব্যবহার করছেন৭৭, কখনো নিচ্ছেন বাইবেলের অংশ৭৮ কখনো স্তোত্র-র মত বাক্যবন্ধ বিন্যাস করছেন। এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত [২৫] সংখ্যক উদাহরণটি লক্ষ্য করা যেতে পারে। বাংলা কাব্যে রেজিস্টার বদল অনেক কবির কবিতাতে লক্ষ্য করা যাবে। যেমন, শঙ্খ ঘোষের যমুনাবতী৭৯, বিষ্ণু দে-র 'টপ্পা-ঠুংরি'৮০ সুভাষ মুখোপাধ্যায়-এর বধূ৮১ প্রভৃতি বহু কবিতার ক্ষেত্রেই কখনো ছন্দ বদলিয়ে, কখনো ভাষা ব্যবহার-এর মধ্য দিয়ে, কখনো কোন কবির বহু পরিচিত পংক্তি বা গানের লাইন অথবা লোক সাহিত্যের উপাদান ব্যবহার করে এই রেজিস্টার বদল ঘটানো হয়েছে।

Saussure চেয়েছিলেন লাতিন কবিতার মধ্য থেকে লুকোন 'key proper name' খুঁজে বার করতেন৮২। এই ধরনের anagram এলিয়ট্-এর কবিতায় অবশ্যই পাওয়া যাবে, কিন্তু তাকে 'key words' বলাই সঙ্গত। J. Kristeva সাহিত্যে বিশেষত কবিতায় anagram ব্যবহারকে 'key word' বলেই বোঝাতে চান ৮৩। এলিয়ট্-এর কবিতায় এই শব্দ যেভাবে এসেছে তা বাক্যকেও বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছে। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা দেখেছি এলিয়ট্-এর কবিতায় 'key phrase' 'key sentence'-এরও সন্ধান মিলবে তাঁর পুনরুক্তি-মূলক সমান্তরাল বাক্য খণ্ড বা বাক্যবন্ধগুলিতে [দ্র. উদাহরণ—১, ২, ৪, ৫, ৭, ৮ প্রভৃতি]। Key word হিসাবে, 'Time', Waste Land', 'rain' প্রভৃতি নানা শব্দের কথাই মনে পড়বে। বাংলা কবিতাতেও নানাভাবে এই জাতীয় শব্দ ঘুরে ফিরে ব্যবহৃত হয়েছে,

অনেকক্ষণ বৃষ্টি থেমে গেছে
বৃষ্টি থেমে গেছে অনেকক্ষণ ৮৪

কর্মের ক্ষেত্রে বিপর্যাস যেমন ব্যবহার করা হয়েছে তেমনি 'বৃষ্টি' কথাটির উপর বিশেষভাবে ফোকাস ফেলতেও চেয়েছেন কবি।

ক. হাওয়ায় হাওয়ায় আসুক আসুক তারা ফিরে ফিরে
বৃষ্টিধারে ৮৫

খ. বৃষ্টি তো নয়, মুঠি মুঠি আনন্দ ফুলঝুরি ৮৬

গ. বৃষ্টি তো নয় মুঠি মুঠি ধান ছড়া ৮৬

বৃষ্টি কামনা-বন্ধ্যাত্ব মোচন এবং ফসলের জন্ম—এই মিথগুলির ছায়া এইসব কবিতায় ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্র কাব্যেও পুনরাবৃত্ত এই বৃষ্টি কামনা,

আরো বৃষ্টি, আরো বৃষ্টি, আরো বৃষ্টি।৮৭

এই বৃষ্টি প্রকৃতিতেই সীমাবদ্ধ থাকে না, পৌঁছে যায় হৃদয়ের গভীরে,

বর্ষা নেমেছে প্রান্তরে অনিমন্ত্রণে ;

... ...

বর্ষা নামে হৃদয়ের দিগন্তে ৮৮

বৃষ্টি শেষের সঙ্গে সময়-এর প্রতিবেশ মিশ্রিত করে দিচ্ছেন তিনি—

ক. বেলা পড়ে এল।
বৃষ্টি-ধোওয়া আকাশ
বিকেলের প্রৌঢ় আলোয় বৈরাগ্যের ম্লানতা

খ. সন্ধ্যা হল।
বৃষ্টি থেমে গেছে ;
জ্বলেছে পথের বাতি।৯০

জীবনানন্দ-র কবিতায় দেখা যাবে, 'পোড়ো জমি'-র প্রসঙ্গ ৯১। কিম্বা সুধীন্দ্রনাথ-এর কবিতায় 'ফণিমনসা', 'মরুভূমি' প্রভৃতি প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য।৯২

এলিয়ট্-এর কবিতায় Analogy ৯৩ বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তা আমরা পূর্ববর্তী উদাহরণগুলির মধ্যে দেখেছি [৫ ক-খ, ৬, ৭ ক-ছ, ৮ ক-গ, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৭, ১৮, ১৯, ২২, ২৩, ২৪, ২৬, ২৭ প্রভৃতি উদাহরণ দ্রষ্টব্য]। সাদৃশ্য-র মধ্য দিয়ে বিশেষ এক উত্তরণের পথে তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন। বিষয়গত পুনরাবৃত্তি কিন্তু আঙ্গিক গঠন, আলাদা এ ধরনের উদাহরণ এলিয়ট্-এর মতো বাংলা কবিতাতেও চোখে পড়বে। বর্তমান প্রবন্ধে [১৪ ও ১৫] সংখ্যক উদাহরণ-এ বক্তব্য এক কিন্তু বাক্যগঠন পৃথক, এই Thematic change চোখে পড়বে। এর সঙ্গে নিচের উদাহরণ-গুলি মিলিয়ে দেখা যেতে পারে।

যৌবনের উচ্ছুসিত সিন্ধুতটভূমে
বসে আছি আমি।

Cf :

আমার অন্তর নিয়ে একাকী বসিয়া আছি আমি
উচ্ছুসিত যৌবনের সিন্ধুতীরে।৯৪

কিম্বা রবীন্দ্রনাথের কবিতায় 'থিমাটিক রিপিটেশন' ব্যবহৃত হয়েছে ; ৯৫

ঘরেতে এল না সে তো, মনে তার নিত্য আসা যাওয়া—
পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর।

Cf :

যে আছে অপেক্ষা করে, তার
পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর।

Daniel L Finer বলেছেন ৯৬ বাক্য 'analogous' হলেও, তা Switch Reference (S. R.) ভাষা বলে মনে করা যেতে পারে। তিনি Chomsky র Government Binding theory অনুসরণে Switch Referance প্যাটার্ণ বাক্যের মধ্যে রয়েছে তা দেখালেন। এলিয়ট-এর কবিতায় সমান্তরাল বাক্যবন্ধগুলির ক্ষেত্রে দুটি বাক্যাংশ (clause) coreferential না noncoreferential তা এই তত্ত্বের দ্বারা লক্ষ্য করা সম্ভব। দ্ব্যর্থবোধকতার ক্ষেত্রেও এই তত্ত্ব কার্যকরী। এলিয়ট-এর সমান্তরাল বাক্যবন্ধগুলির যে সব উদাহরণ এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে তা লক্ষ্য করলে সহজেই তা বোঝা যাবে। বাংলা কবিতায় সমান্তরাল বাক্যবন্ধগুলি অতঃপর লক্ষ্য করা যাক। কিন্তু তার আগে এই S R. তত্ত্বের আলোকে এলিয়ট্-এর অন্য একটি উদাহরণ বিশ্লেষণ করে দেখানো যাক,

Let us go then, you and I,
Let us go, through ..
Let us go and make our visit ৯৭

বাক্যাংশগুলির পুনরাবৃত্তি অন্য একটি বিষয়ের দ্বারা আবদ্ধ। আমরা এলিয়ট্-এর বাক্যবন্ধগুলি দেখব একটি চালিত বাক্যাংশ (operator) এবং তৎসহ অন্য চল (variable) বাক্যাংশ এক বা একাধিক ব্যবহৃত হয়ে কবিতার ভাষায় বিশেষ প্যাটার্ন সৃষ্টি করেছে ৯৮। PCOB-তত্ত্বের দ্বারা আমরা এই সমান্তরাল বাক্যাংশগুলিকে সবচেয়ে সহজ ব্যাখ্যা করতে পারব। 'Let us go' যদি চালক operator হয় তাহলে 'You and I...'

'through certain half deserted streets...'. 'make our visit' ইত্যাদি চল (variables)' 'চালক'-এর দ্বারা আবদ্ধ (bound)। সূত্রাকারে বিন্যস্ত করলে,

O (=operator) ——— x (a variable)
O (bound by)
O ———y
O ———z

[Let us go] [x=you and I, y=through certain...
z=make our visit etc.]

এবারে আমরা এই ধরনের বাংলা কবিতা নিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখাতে পারি,

চালক (operator=O) চল (variable)
[দ্বারা আবদ্ধ]

ক. এই আমার ছিল — —— ভয়
এই আমার ছিল ——— আশা ১০০

খ. [কত যুগ থেকে] অনেক — ভাবনা
[ওদের] অনেক — সমস্যা
অনেক — প্রয়োজন,
অনেক — দীর্ঘ ইতিহাস ১০১

গ. মনে হয়েছিল — আজ সবকটা দুর্গই
মনে হয়েছিল — অন্তহীন এই দুঃখ
মনে হয়েছিল — পন্থহীন নৈরাশ্যের বাধায়

ঘ. .... — তোমার সব
ভাবনা — তোমার টাকার
ভাবনা — স্বাস্থ্যের

ঙ. শাপভ্রষ্ট দেব — তুমি
শাপভ্রষ্ট দেব — আমি
শাপভ্রষ্ট দেব — শিশু আমি

চালক চল
[দ্বারা আবদ্ধ]

চ. সে বন্ধন —চলে মোর সাথে সাথে/জীবনের নিত্য অভিসারে/সুন্দরের মন্দিরের পানে

সে বন্ধন —মগ্ন করি রেখেছে আমারে/আকণ্ঠপঙ্কের মাঝে।

সে বন্ধন —লক্ষ লক্ষ লাঞ্ছনার...

ছ. এক একটা —মানুষের দুর্গের মতো দুর্ভেদ্য

এক একটা —ইটের টুকরো করাতের মতো তীক্ষ্ণ

এক একটা —কৃষক পাহাড়ের মতো অনধিগম্য

এক একটা —মজুর সড়কির মতো অব্যর্থ

জ. আমাদের —হাঁকে রূপনারানর স্রোত ফিরে যাক

আমাদের —সড়কিতে কেউটে আধার ফর্সা হয়ে যাক

আমাদের —হৃৎপিণ্ডের তাল দামামার মতো

ঝ. বিদ্ধ

কেউ বিদ্ধ —রূপে

কেউ —রূপোয়

কেউ বিদ্ধ —কথায়

কেউ —নীরবতায়

কেউ বিদ্ধ —আশায়

কেউ —হতাশায়

কেউ বিদ্ধ —সময়ে

কেউ —হতাশায়

(ঝ) সংখ্যক উদাহরণটির সঙ্গে এলিয়ট্-এর [১৮] সংখ্যক উদাহরণটির একটি মিল বিশেষভাবে চোখে পড়বে। এভাবে, একের পর এক উদাহরণ আরো অনেক কবির কাব্য থেকেই আমরা তুলে ধরতে পারি। এলিয়ট্ ধ্রুবাপদের মতো যে পংক্তিগুলো ব্যবহার করেছেন, সেখানে আমরা ব্যবহারের ক্ষেত্রে বারবার বলে পাঠকের মনের মধ্যে আঘাত করা—এই কারণ যেমন লক্ষ্য করেছি, তেমনি [PCOB] তত্ত্বের আলোকে এভাবেও দেখতে পারি যে, সমগ্র কবিতায় তা 'চালক' (operator)-এর কাজ করছে। রাম বসু-র একটি কবিতায় এই জাতীয় ব্যবহার লক্ষ্য করে আমরা আলোচনার শেষ প্রসঙ্গে উপস্থিত হব।

চালক চল

[যারা আবদ্ধ]

—ব্যথারধির মুখের ভিড়ে…ধুলিশয্যায়ী

কাঁদছি আমি কারণ আমি
এখনো বেঁচে আছি

—মরণ তবে…বিল

কাঁদছি, কান্না যেন প্রাণের
কাছাকাছি

—উপরকণ শূন্য হল…গেছে ছেয়ে

কাঁদছি আমি, কান্না যেন
প্রাণের মূলধন

কারণ আমি এখনো বেঁচে আছি
কান্না যেন প্রাণের কাছাকাছি
[কাঁদছি আমি] — কান্না যেন প্রাণের মূলধন
কান্না যেন ফিরিয়ে দেয় মন
কান্না যেন ক্ষণিক বিস্তার
প্রাণের কাছাকাছি
[কান্না যেন] — প্রাণের মূলধন
ফিরিয়ে দেয় মন

অমিয় চক্রবর্তী এলিয়টে্র কবিতা সম্পর্কে বলেছেন,

> 'শাদা পাথরকে স্তবকে স্তবকে পুষ্পিত ক'রে তোলা আশ্চর্য কবি কারিগর এলিয়টের সাধ্য'।

আবার তিনি বলেছেন,

> 'কেবলমাত্র এই মন্ত্রধ্বনিত কাব্য, বিরল দৃঢ় চিত্রণের ভাষা মনে ধারণ ক'রেই এলিয়টের নবতম কবিতাটিকে উপভোগ করা চলে।

● স্তবকে স্তবকে পুষ্পিত করে তোলা এবং মন্ত্রধ্বনিত বিরল চিত্রণ তাঁর কাব্যে এসেছে। তার গঠনগত কৌশল রূপক অলঙ্কার ছন্দ গদ্য-পদ্যময়তা সব কিছু নিয়েই বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। এসব ক্ষেত্রেও আমরা দেখব একটি বিশেষ শব্দ বা বাক্যাংশ এবং সেই বাক্যাংশ থেকে খণ্ডিত শব্দদ্বারা অন্য

বাক্যাংশ নির্মাণ এই পুষ্পিত স্তবক বিন্যাসের প্রধান কৌশল। সেখানে চালিত (operate) করছে এক থেকে সৃজিত আর এক। উদাহরণ নিয়ে বোঝা যাক বিষয়টি—আমাদের প্রদত্ত [২১] সংখ্যক উদাহরণটি দেখা যাক; এখানে আমাদের সুবিধার জন্য প্রত্যেক উপাদান (constituent)-কে চিহ্নিত করে নিচ্ছি,

To prepare a face to meet the faces that you meet.

a b c d a e f d-pl. g h e

[a b c] → [d] [a e f] → [d-]

চল → চালক ← চল → চালক

[a b c d a] ← [e] [f d g h] → [e]

চল → চালক ← চল → চালক

কিছু বাংলা কবিতার প্যাটার্ন আমরা লক্ষ্য করে এ বিষয়ের সমাপ্তি এখানেই টানব।

ক. মনে পড়ে এসব ঘটেছে অনেক কাল আগে

ক খ গ ঘ ঙ চ

আবার ঘটে যেন এই ইচ্ছে, কিন্তু লিখে রাখো

ছ গ জ ঝ ঞ ট ঠ

এই লিখে রাখো

ঝ ঠ

খ. মোর আপনারে আমি নবজন্ম করিয়াছি দান।

ক খ গ ঘ ঘ' ঙ চ

নিখিলের স্রষ্টা তুমি, তোমার উদ্দেশ্যে আজি তাই,

ছ জ ঝ ঝ' ঞ ট ঠ

মোর এই সৃষ্টি কার্য উৎসৃষ্টি করিনু সন্তর্পণে।

ক ড ঢ ণ ত+ঢ থ দ

মোর এই নব সৃষ্টি এ যে মূর্ত বন্দনা তোমার

ক ড য+ঢ ধ ন প ঝ'

গ. বর্তমান কাল আর ভূত কাল, উভয়ে বুঝিবা

ক খ গ ঘ খ ঙ চ

বর্তমান ভাবী কালে এবং আশ্রিত

ক ছ খ জ ঝ

ভাবী কাল ভূত কালে। যদি হয় নিত্য বর্তমান

ছ খ ঘ খ এ ট ঠ ক

সর্বকাল, তবে সর্বকালের উদ্ধার

ড খ ঢ ড খ ণ

এলিয়ট-এর বাক্য নির্মাণ পদ্ধতি যেমন বাংলা কবিতায় বিশেষ ছাপ ফেলেছে তেমনি তার শব্দ ব্যবহারও বাংলা কবিতায় চোখে পড়বে, সে সম্বন্ধে দু-চার কথা এ প্রবন্ধে বলাও হয়েছে। কিন্তু, বাকি রয়ে গেল আরও অনেক কথা, এলিয়ট-এর প্রশ্নবাক্য ব্যবহার এবং বাংলা কবিতায় বিশেষতও জীবনানন্দের কবিতায় এই প্রশ্ন বাক্য ব্যবহার বিশেষ ভাবে ফুটে উঠেছে।

'Do I dare ?' and, 'Do I dare ?

এর সঙ্গে তুলনা করা যায়

দেখিবে সে মানুষের মুখ ?

দেখিবে সে মানুষীর মুখ ?

দেখিবে সে শিশুদের মুখ ?

বলা হলো না এলিয়ট পাশাপাশি শব্দ / বাক্যাংশ প্রায় বিপরীত অর্থে ব্যবহার করেছেন।

visious and revisious

কিম্বা,

to be said, or left unsaid

বাংলা কবিতায় তার-ও ছায়াপাত ঘটেছে

কোথাও তার সমতল, কোথাও অসমতল

বাকি রয়ে গেল, এলিয়ট প্রথম এবং তৃতীয় বন্ধনী চিহ্ন ব্যবহার করেছেন, সম্পূর্ণ পংক্তি ক্যাপিটাল লেটারে লিখেছেন ইত্যাদি প্রসঙ্গ [১৭ সংখ্যক উদাহরণ দ্রষ্টব্য]

[They will say ; 'How……]

(এইখানে অনাস্তিকে বলে রাখি

………………… কপালে)

(বালিয়াড়ি পার হলে আছে এক জলের ইশারা।)

এলিয়ট তাঁর কবিতায় ইংরেজি ভাষার মাঝখানে অন্য ভাষার পংক্তি যেমন ব্যবহার করেছেন বাংলা কবিতার ক্ষেত্রেও সে জাতীয় ব্যবহার আছে,

'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ?'

রেজিষ্টার বদল-এর ক্ষেত্রে কোন বিখ্যাত পংক্তির অনুবাদ ব্যবহার বাংলা কবিতাতেও এসেছে,

'দে দেব, তোমার যে কল্যাণতম রূপ
সে তো আমার অন্তরে প্রকাশ পেল না
ঘোচাও তোমার আবরণ।'

কিম্বা

'যক্ষচারী বলে উঠেছে
মাগো, পাহাড়সুদ্ধ নিল বুঝি উড়িয়ে।

বাকি রয়ে গেল, এইসব আলোচনা।—তবুও বাংলা কাব্য সাহিত্যে এলিয়ট্-এর বাক্য নির্মাণ কৌশল যে চকিত দীপ্তি সৃজন করেছে তার আভাসটুকু এখানে বিধৃত করে রাখলাম। কেবলমাত্র এলিয়ট্-এর বাক্য নির্মাণ কৌশল-ই দীর্ঘ গবেষণার অপেক্ষা রাখে। তদুপরি বাংলা কবিতায় তার প্রতিফলন অনুসন্ধান, আশা করি, এই নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধে বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ মেটানোর ব্যর্থ প্রচেষ্টা করেছি মাত্র॥